

Vol. 2, No. -3, July - September 2012

CHETANA LAHAR - Quarterly Bengali magazine of DAFODWAM
(Democratic Action Forum of Dalits, Women & Minorities)

চেতনা একটি ত্রৈমাসিক : বাংলা পত্রিকা

- অর্থহীনতা, যতদিন, সংরক্ষণ, ততদিন
- শ্রেণী সংগ্রাম-শ্রেণী ঐক্য বহুজনে রেখে এসপি, এসটি, ওবিসি, সংখ্যালঘু, মহিলাদের অধিকার আন্দোলন গড়ে তুলুন
- সাম্রাজ্যবাদ, রাস্তাঘাটের ককবল থেকে ভারতবাসীদের মুক্ত করুন
- উন্নয়নের বাহনায় অমানবিক উচ্ছেদ বন্ধ হোক
- বিদেশী পুঁজি ব্যতীত কল্যাণ কল্পে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ ঘটান

DAFODWAM thinks that India is a de facto upper caste Hindu state and Brahminism derived from MANU SANGHITA is still the guiding philosophy of the Indian ruling classes. Until the abolition of the caste system and discrimination based on gender and community there is no chance of the victory of class struggle, in whatever form.

Besides taking programmes of rights of Dalits, Women and Minorities (Religious and Linguistics,) DAFODWAM is in the area of publication of books on concerned subjects in different languages.

For Correspondence :

ananta acharya
DAFODWAM
30/2 N.P. Road, Kolkata - 700055.
West Bengal, India
Ph: (0)9331858854

Email- dafodwam@gmail.com
anantaacharya1949@gmail.com

Exchange Price - 30/-

Edited and Published by ananta acharya on behalf of DAFODWAM,
30/2 N.P. Rd, Kolkata - 700055 and Printed at Sandeep Mukherjee - 4 D.P.S. Rd, Kolkata - 700033



চিহ্নিত কর, তুলীত মাথায় জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১২

চেতনা

CLASS CASTE RELATIONS MARXIST APPROACH

DAFODWAM PUBLICATION

For Collection :-

Mail : dafodwam@gmail.com

or

Call : (0) 9331858854

যাঁদের রচনাবলী অবশ্য পাঠ্য

কার্ল মার্কস, জোতি বা ফুলে, রামরামী পেরিয়ার,
বেগম রোকেয়া, আবদকর, ভগৎ সিং

যাঁদের রচনাবলী পাঠককে মুক্তনামা হ'তে সহায়তা করবে

অক্ষয়কুমার দত্ত, ক্রোনাথী, রামেন সাকুভায়ান,
সেইফুদ্দীন চট্টোপাধ্যায়, সুফারী ভট্টাচার্য,
আরজ আলি মাতুব্বর, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, আহমেদ শরিফ,
আশিষ গাহ্রী, ভবানীপ্রসাদ সার

নাঈশংক

বেগম রোকেয়া

মাননীয় উপস্থিত ভগিনীবৃন্দ,

আপনারা আমার ন্যায় তুচ্ছ নগণ্য ব্যক্তিকে এ সময়ের জন্য সভানেত্রীপদে বরণ করিয়া আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তজন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।
নাঈশংক আমি অবশ্যই বলিব যে আপনারদের নির্বাচন ঠিক হয় নাই। কারণ আমি আজীবন
নাঈশংক সামাজিক পদবি অত্যন্তভাবে লোহার সিন্দুকে বদ্ধ আছি—ভালিগোপ সামাজ্যে মিশিতে
পারি নাই। এমনকি সভানেত্রীকে হাসিতে হয়, কানিতে হয়, তাহাত আমি জানি না।
সতরাং আমার ভাষায় কথায় অনেক তুলতালি থাকিলে, আপনারা গ্রহণত থাকুন।

অজ্ঞানপদ ভগিনী মিসেস লিভনে আমাকে মুসলমান বাজিকরের শিক্ষা সাবক্ষীয় অভাব-
অভিযোগের কথা বলিতে অনুগ্রহ করিয়াছেন। সমবেত সুশিক্ষিত গ্রাঞ্জিওট মহিলাদের
সম্মুখে এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিব, এমন যোগ্যতা আমার নাই। তবে ২০/২১
বৎসর হইতে সাহিত্য ও সমাজসেবা করিয়া, বিশেষত ১৬ বৎসর যাবৎ সাখাওয়াত
মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল পরিচালনা করিয়া যতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি তাহাই
আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহস করিতেছি।

খ্রিস্টাব্দে কথা বলিতে গেলেই আমাদের সামাজিক অবস্থার আলোচনা অনিবার্য হইয়া
পড়ে, আর সামাজিক অবস্থার কথা বলিতে গেলে, নারীর প্রতি মুসলমান আত্মবৃক্ষের
ব্যবহেলা, ঈদাশ্য এবং অনুদার ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষপাত অনিবার্য হয়। প্রবাদ আছে,
নাঈশংক আপন দুগ্ধ পরলিন্দা হয়। কেমন প্রশ্ন এই যে, মুসলমান বাজিকরের সুশিক্ষার
ব্যয় কি? আপনারা হয়ত অনিয়া আশ্চর্য হইবেন যে আমি আজ ২২ বৎসর হতে
ভারতের সর্বাপেক্ষা নিকট জীবের জন্য রোদন করিতেছি। ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা নিকট
রূপ কাহারও জানেন? সে জীব ভারতনারী। এই জীবজন্তির জন্য কখনও কাহারও পরান
নাঈশংক নাই। মহাশয় গান্ধী সম্প্রদায় জাতির দুগ্ধে বিচলিত হইয়াছেন, স্বয়ং যার্ডক্রোশ গাভিতে
নাম করিয়া দিচ্ছে রেলপথিকদের কষ্ট হ্রাসদময় করিয়াছেন। পশুর জন্য চিঙা করিবারও
নাঈশংক ব্যাঘ্র, তাই যত্নেত পশুশ্রেণী নিবারণী সমিতি গঠিতে পাই। পাশে কুকুরটা মোটরগা

ক্রীশিক্ষার বিরোধিগণ বলে যে, শিক্ষা পাইলে ক্রীলোকেরা অশিষ্ট ও অনম্যা হয়। ইহারা নিজেদের মুসলমান বলেন, অথচ ইসলামের মূল সূত্রের এমন বিরুদ্ধাচরণ করেন। যদি শিক্ষা পাইয়া পুরুষগণ বিপথগামী না হয়, তবে ক্রীরা কেন বিপথগামিনী হইবে? এমন জাতি, যাহার নিজের অর্থে লোককে মুর্থতা ও পর্দা রূপে কারাগারে আবদ্ধ রাখে, তাহারা অন্যান্য জাতির যাহারা সমানে সমানে ক্রী শিক্ষার প্রচলন করিয়াছেন, তাহাদের সহিত জীবনসংগ্রামে কিরূপে প্রতিযোগিতা করিবে? ভারতবর্ষে এক কোটি লোক ভিক্ষাজীবী, তন্মধ্যে মুসলমান সংখ্যাই অধিক। সুতরাং তাহারা কোন মুখে অন্য জাতির সহিত সমকক্ষতা করিবে? আমরা আবার কৌলীন্যের বড়াই করি। ভিক্ষাবৃত্তি সর্বাপেক্ষা নীচ কাজ আর মুসলমানের সংখ্যাই ইহাতে অগ্রণী। ইহার কারণ এই যে, তাহারা ক্রীলোকদিগকে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধনে বঞ্চিত রাখিয়া সর্ববিষয়ে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। ফলে তাহাদের গর্ভজাত সন্তান অলস ও শ্রমকাতর হয়; সুতরাং বাপদাদার নাম লইয়া ভিক্ষা ছাড়া তাহারা আর কি করিবে?

এখন ক্রীলোকেরা ভোটদানের অধিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু মুসলিম মহিলাগণ এ অধিকারের সদ্ব্যবহারে বেঙ্ঘায় বঞ্চিত করিয়াছেন। গত ইলেকশনের সময় গেল কলিকাতায় মাত্র ৪জন ক্রীলোক ভোট দিয়াছে। ইহা কি মুসলমানের গৌরবের বিষয়? তাহারা কোন সুযোগের আশায় বা অপেক্ষায় বসিয়া আছেন?

যে পর্যন্ত পুরুষগণ শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে ক্রীলোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য অধিকার দিতে স্বীকৃত না হয়, সে পর্যন্ত তাহারা ক্রীলোকদিগকে শিক্ষাও দিবে না। যাহারা নিজের সমাজকে উদ্ধার করিতে পারিতেছে না, তাহারা আর দেশোদ্ধার কিরূপে করিবে? অর্ধাঙ্গীকে বন্দি রাখিয়া নিজে স্বাধীনতা চাহে, এরূপ আকাঙ্ক্ষা পাগলেরই শোভা পায়। সদাশয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যেমন ভারতবাসীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা সহ্য করিতে চান না — আমার মনে পড়ে প্রায় ২১ বৎসর পূর্বে মিষ্টার মর্লি বলিয়াছিলেন, ‘যদি তাহারা চাঁদের জন্য আপ্সার করে (If they cry for the moon) তাহা আমরা দিতে পারি না’। ইত্যাদি এবং আমাদের অমুসলমান প্রতিবেশিগণ এখন সাধারণত যেরূপ মুসলমানদের দাবিদাওয়া সহ্য করিতে পারেন না, সেইরূপ মুসলমান পুরুষগণও নারীজাতির কোন প্রকার উন্নতির অভিলাষ স্বীকার করিতে চাহেন না। আমরা পরস্পরের সাথে এরূপ ভাবে জড়িত অছি যে, একে অপরকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারি না। মুসলিম ভ্রাতৃগণ যতদিন আমাদের দুঃখ-সুখের প্রতি মনোযোগ না করিবেন ততদিন তাহাদের কথাও ভারতের অপর ২২ কোটি লোক শুনবে না, আর যতদিন ঐ ২২ কোটি লোক ৮ কোটি মুসলমানকে

উপেক্ষা করিবে ততদিন পর্যন্ত তাহাদের রোদনও ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে না। বহুদিন হইল একটি বটতলার পুঁথিতে পড়িয়াছিলাম :

‘আপনি যেমন মার খাইতে পারিবে,
বুঝিয়া তেরছাই মার আমাকে মারিবে।’

মুসলমানদের যাবতীয় সৈন্য-মুর্দশার একমাত্র কারণ ক্রীশিক্ষার উদাস্য। ভ্রাতৃগণ মনে করেন, তাহারা গোটাকতক আলীগড় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর করিয়াই পুলসিরাত। (পারলৌকিক সেতু বিশেষ) পার হইবেন—আর পার হইবার সময় ক্রী ও কন্যাকে হান্ডব্যাগে পুরিয়া লইয়া যাইবেন।

মালগাড়িতে বসিয়া সপরিবারে স্বর্ণলাভের আশায় না থাকিয়া স্থায়ী কন্যাদের সুশিক্ষায় মনোযোগী হন। কন্যার বিবাহের সময়ে যে টাকা অলংকার ও যৌতুক ক্রয়ে ব্যয় করেন, তাহারই কিয়দংশ তাহাদের সুশিক্ষায় ও স্বাস্থ্য রক্ষায় ব্যবহার করুন। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শারীরিক ব্যায়ামচর্চা করা প্রয়োজন আর প্রয়োজন বিশুদ্ধ বাতাস। শীতকালে তাহারা এরূপভাবে জানালা দ্বার বিশেষত সার্সী বন্ধ করিয়া রাখেন যে আমার মনে হয়, গর্ভনমেট কেন আইন করিয়া দ্বার জানালার সার্সী বন্ধ করিয়া রাখেন যে আমার মনে হয়, গর্ভনমেট কেন আইন করিয়া দ্বার জানালার সার্সী ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করেন না। পাঁচ ছয় বৎসর হইল ডাক্তার মিস কোহেন বালিকা বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমাদের স্কুলের কতিপয় বালিকার স্বাস্থ্যের রিপোর্ট, যখন তাহাদের মাতার নিকট এই অনুরোধ গেল যে, ‘আপনারা অনুগ্রহপূর্বক শীঘ্র ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করুন।’ তাহাতে তাহারা চটিয়া এই উত্তর দিলেন — স্কুলমে লড়কী পড়নে কো দিয়া হায়, না বিচার করনে কো, কে আঁখ কমজোর, দাঁত কমজোর, হলক মে ঘাও হায়, ফেঞ্চড়া খারাব হায়। ইয়ে সব বোলনে সে হামারী লড়কী কা শাদী ক্যায়সে হোগা? ইয়ে সব বাৎ রহনে দে, হামারী লড়কী কা, ডাক্তারনীসে না দেখায়ে।’ মেয়ের প্রাণ লইয়া টানটানি, অথচ শাদীর চিন্তায় মায়ের চোখে ঘুম ধরে নাই। ফল কথা, অশিক্ষিতা মাতার নিকট ইহাপেক্ষা আর কি আশা করা যাইতে পারে।

আমাদের স্কুলের ছাত্রীগণ পরীক্ষার সময় প্রারম্ভে ভূগোল ইতিহাস স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিষয়ে অকৃতকার্য (ফেল) হয়, ইহার কারণ এই যে, তাহারা নিজেদের বাসভবন এবং স্কুলগৃহ গভীরত দুনিয়ার আর কিছুই দেখিতে পায় না, এই দুনিয়ায় তাহাদের পিতা-ও ভ্রাতা ছাড়াও আরও কেহ আছে কিনা, তাহা তাহারা জানে না, রন্ধ বায়ুপূর্ণ কক্ষে আবদ্ধ থাকিয়া মা মাসীকে অনবরত রোগ ভোগ ও স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে দেখে। তাহারা কেবল জানে অসুখ

হইলে ডাক্তার ডাকিতে হয়। এই সকল কুরোগের একমাত্র ওষুধ সুশিক্ষা।

উপসংহারে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল এবং কলিকাতা মুসলিম সমাজের উন্নতির নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার এখনও পূর্ণ মাত্রায় সফলতা লাভ করে নাই। স্কুলটিকে হাই স্কুলে উন্নীত করা এবং ইহার জন্য একটি নিজের বাড়ি হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন এবং আঞ্জুমানটি মহিলাসমাজে সর্বজনপ্রিয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আজ আপনাদের অনেকখানি সময় নষ্ট করিলাম তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এখন আমি ইতি করি।

অভিযুক্ত ।

(এবং স্বাক্ষর)

ডিম্বু সান, এল. রোকেয়া এম.বি.

প্রতিষ্ঠাপক,
১ম ও ২য় বর্ষের উচ্চ
বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা পরিদপ্তর।
এম.
১ম ও ২য় বর্ষের উচ্চ
বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা পরিদপ্তর।
১ম ও ২য় বর্ষের উচ্চ
বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা পরিদপ্তর।

১ম খণ্ড মতিচূর
বেগম রোকেয়া

সমালোচনার উত্তর

মেঘনাদ সাহা

গত নভেম্বর মাসে আমি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে শান্তিনিকেতনে গমন করি। কবির অনুরোধে তথায় শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলীর সম্মেলনে একটি বক্তৃতা প্রদান করি; স্বয়ং কবি এই বক্তৃতায় উপস্থিত থাকিয়া আমাকে অনুগৃহীত করেন। এই বক্তৃতা সমস্ত দৈনিক পত্রে প্রকাশিত হয়। তাহার পর ইহাতে দৈনিক ও মাসিক পত্রে উক্ত বক্তৃতার বহু সমালোচনা বাহির হয়। সেই সময় হঠাৎ অল্পোপচারে শয্যাগত থাকায় আমি যথাসময়ে এই সমস্ত সমালোচনার উত্তর দানে অসমর্থ হই। সম্প্রতি গত বৈশাখের 'ভারতবর্ষ'—এ পন্ডিতেরী-প্রবাসী শ্রীঅনিলবরণ রায় আমার বক্তৃতার বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ গড়িয়া তুলিয়াছেন। দুঃখের বিষয় উক্ত প্রবন্ধ পাঠে প্রতীত হয়, তিনি আমার বক্তৃতার মর্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই, পরন্তু নানারূপ কল্পিত অর্থ করিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; তজ্জন্য এই উত্তর দিতে বাধ্য হইলাম।

এই বক্তৃতা সম্বন্ধে সমালোচক বলিয়াছেন—“লক্ষপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে হিন্দুর দর্শন ও হিন্দুর ধর্ম সম্বন্ধে কতকগুলি মন্তব্য করিয়া যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে তিনি কোনও মৌলিক গবেষণার পরিচয় দেন নাই; পরন্তু এ বিষয়ে অজ্ঞ ও পক্ষপাতদুষ্ট পাশ্চাত্য সমালোচকগণের কতকগুলি মামুলি কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।”

আমার বক্তব্য — কোনও লোক যত বড়ই ইউন স্বীকার না করিয়া তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি করা আমার স্বভাব নয়। আমার বক্তৃতা সম্পূর্ণ মৌলিক। আমি কোন পাশ্চাত্য সমালোচকের মামুলি কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছি — তাঁহার বা তাঁহাদের নাম, ধাম ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রামাণ্য উল্লেখ উপস্থিত করিলে বাধিত হইব। যদি তিনি তাহা না করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার উচিত এই উক্তি প্রত্যাহার করা। হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের অপূর্ণতা সম্বন্ধে আমার মন্তব্য তাঁহার রচিকর না হইতে পারে, কিন্তু কিনা প্রমাণে কাহাকেও আন্যের

উক্তির প্রতিধ্বনিকারী বলিয়া অপবাদ দেওয়া একান্ত ভ্রমজনবিহর্ষিত বলিয়া মনে হয়। পুনরায় তিনি বলিয়াছেন, “হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর ধর্ম ও ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য ডক্টর সাহা যদি কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেন, পরের মুখেই ঝাল না খাইতেন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিতেন যে ঐ বিষয়ে ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা তাঁহার ন্যায় বৈজ্ঞানিকের পক্ষে উপযুক্ত হয় নাই।”

বর্তমান সমালোচকের মত অনেক সমালোচকই বোধহয় কল্পনা করিয়াছেন যে আমি হিন্দু ধর্মের ও দর্শনের কোন মৌলিক গ্রন্থ পড়ি নাই। এরূপ ধারণা করিবার পূর্বে একটু অনুসন্ধান করিয়া লইলে বুদ্ধিমানের কাজ হইত। যাহা হউক, আশা করি এই প্রত্যুত্তর পাঠে তাঁহার ভ্রান্তির নিরসন হইবে।

সমালোচক মোটের উপর বলিতে প্রয়াসী হইয়াছেন যে হিন্দুর ধর্ম ও দর্শনে শ্রেষ্ঠ সভ্যতা গঠনের, এমনকি বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা গঠনের সমস্ত আদর্শই বর্তমান আছে। সমালোচকের মতে বর্তমান লেখকের মত অনেক অনভিজ্ঞ লোক অনর্থক বিভ্রান্ত হইয়া বর্তমান সভ্যতার দিকে আকৃষ্ট হয়। তাঁহার বিশ্বাস যে হিন্দুর দর্শন ও বিজ্ঞানে ক্রমবিকর্তনবাদ (Theory of Evolution) পৃথিবীর সূর্যপ্রদক্ষিণবাদ (Heliocentric theory of solar system) ইত্যাদি বর্তমান বিজ্ঞানের যাবতীয় মূলতত্ত্ব, এমনকি National Planning পর্যন্ত স্পষ্টভাবে স্বীকৃত আছে, না হয় বীজাকারে প্রচ্ছন্ন আছে। আমি এই প্রবন্ধে দেখাইব যে সমালোচকের মত শুধু ভ্রান্ত নয়, বিরাট অজ্ঞতাগ্রস্ত। শশধর তর্কচূড়ামণি যখন এইরূপ মতবাদ প্রচার করিতেন তখন তাঁহাকে লোকে ক্ষমা করিতে পারিত।

এই সমস্ত প্রতিপাদনের জন্য সমালোচক আরম্ভ করিয়াছেন —

“হিন্দুধর্ম ও দর্শনের মূল বেদ।”

সমালোচক কি অবগত নহেন যে বিগত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পাঞ্জাবের হরপা ও সিন্ধুদেশের মহেঞ্জোদারোতে দুইটি অতি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন — যাহার ফলে ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও মোটামুটি ভারতীয় সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছে। সমস্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও অধিকাংশ দেশী পণ্ডিতের মতে (যেমন রামপ্রসাদ চন্দ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিলজাশঙ্কর গুহ) এই সভ্যতা প্রাগৈতহিক ও প্রাক-আর্য। এই দুইটি নগরী

আনুমানিক ৩৫০০ পূঃ খৃঃ অব্দ হইতে ২৫০০ পূঃ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। এই দুই নগরীর ধ্বংসাবশেষে বৈদিককালীন সভ্যতা বা অসভ্যতার কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ আবিষ্কার করিয়াছেন যে এই সিদ্ধনদীবাহিত সভ্যতা দক্ষিণে গুজরাট ও পূর্বে গঙ্গাযমুনায় অববাহিকার উত্তরাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এই সভ্যতা তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুমেরীয় ও মিশরীয় সভ্যতার মত উন্নতস্তরের ছিল। বর্তমানে পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে হিন্দুর ধর্ম ও দর্শনে অধিকাংশ উপাদানই উক্ত প্রাগৈতহিক প্রাক-আর্য সভ্যতা হইতে গৃহীত — যেমন শিব-পশুপতির পূজা, ধ্যান, যোগ, ফুলনৈবেদ্য দিয়া পূজা-পদ্ধতি এবং সম্ভবতঃ পশু, সর্প ও বৃক্ষসেবতার পূজা।

কাজেই হিন্দুর সমস্তই ‘ব্যাডে’ আছে একথা প্রস্তরীভূত (fossilized) পাণ্ডিত্যভিমानी ব্যতীত এই যুগে কেহ বলিতে সাহসী হইবেন না।

তথাকথিত বৈদিক সভ্যতার পরিচয় শুধু ঋগ্বেদের অতি দুর্বোধ্য ঋক্-গুলি হইতে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বৈদিক সভ্যতার কোন বাস্তব প্রমাণ (material proof) এ পর্যন্ত ভারতবর্ষের মাটিতে পাওয়া যায় নাই। পাওয়া গিয়াছে সুদূর এশিয়া মাইনরে; প্রায় ১৪৪০ পূঃ খৃঃ অব্দের যে Mitanian জাতির মধ্যে উক্ত বৈদিক সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহারা তৎকালীন মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতা সম্বন্ধে এতদূর উচ্চধারণা পোষণ করিত যে মনে হয় তাহাদের নিজস্ব সভ্যতা খুবই উচ্চস্তরের ছিল না। অথচ এই সময়ের প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে প্রায় মিশরীয় সভ্যতার সমতুল্য, সুতরাং বৈদিক সভ্যতা হইতে উন্নতস্তরের প্রাগৈতহিক ও প্রাক-আর্য সিদ্ধনদীবাহিত সভ্যতা প্রচলিত ছিল। সুতরাং ধরা যাইতে পারে, যে “বৈদিক অসভ্যতা” সভ্যতার ভারতবর্ষ গায়ের জোরে দখল করিয়া নিজেদের শাসন স্থাপন করিলেও ভারতীয় সভ্যতাকে সম্পূর্ণ বেদমূলক করিয়া তুলিতে পারে নাই। বেদের কর্তৃত্বের নীচে প্রাচীনতর ভারতীয় সভ্যতার ধারা বরাবরই প্রবাহিত হইতেছে। ২

লেখক হয়ত পন্ডিতেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে এতটা ব্যস্ত আছেন যে গত পনের বৎসর জ্ঞানবিজ্ঞানের রাজ্যে নূতন আবিষ্কারের কথা তাহার কর্ণে পৌঁছায় নাই এবং ধ্যানে বসিয়াও হয়ত অস্তৃষ্টির দ্বারা এই সমস্ত জ্ঞানলাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তাঁহার “যদি কিছুমাত্র জ্ঞান থাকিত” তাহা হইলে তিনি প্রথমেই এতবড় একটা ভুল কথা বলিতে সাহসী হইতেন না।

প্রত্নতত্ত্বের বিসম্বাদপূর্ণ তর্ক না হয় ছাড়িয়াই দিলাম; কিন্তু তিনি কি জানেন না যে এই ভারতবর্ষেই সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে সিদ্ধদেশীয় প্রত্নৈতিক ও প্রাক-আর্য সভ্যতার আবিষ্কারে পূর্বেও অন্যরকম মতও প্রচলিত ছিল। তিনি কি জানেন না যে — যে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম ভারতের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ রচনা করিয়াছিল সেই উভয় ধর্মেই বেদকে সম্পূর্ণ জাতিমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি কি জানেন না যে লোকায়ত মতে

ত্রয়ঃ বেদকর্জরঃ ভক্ত-ধূর্ত নিশাচরাঃ।

অর্থাৎ খৃষ্টের কিছু পূর্বে ভারতবর্ষে একদল যুক্তিবাদী ছিলেন, যাহারা মনে করিতেন যে বেদের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করা দুর্লভ; শুধু কতকগুলি ভক্তলোকে বেদের অর্থ না জানিয়াও বেদের লোহাই দিয়া ভ্রান্তমত প্রচার করে। এখনও এই শ্রেণীর লোকের অভাব নাই।

সূতরাং হিন্দুর ধর্ম ও দর্শনের গোড়া বেদে খুঁজিতে যাওয়া প্রায় পনের আনা ভ্রাম্যাক এবং এই ভুলের জন্য সমালোচকের প্রবন্ধটি আগাগোড়া ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া আছে।

লেখক স্বর্ণবেদের দশমমণ্ডলের পুরুষসূক্তে ভারতে প্রচলিত জাতিভেদের গোড়া খুঁজিতে গিয়াছেন। সকল পণ্ডিতদের মতেই দশমমণ্ডল অত্যন্ত পরবর্তী কালের; শুধু যখন এই সূক্ত রচিত হয় তৎকালপ্রচলিত জাতিভেদের একটি দার্শনিক ব্যাখ্যামাত্র। ইহাতে জাতিভেদের উৎপত্তির কোন ইতিহাস নাই, ইহাতে শুধু প্রচলিত জাতিভেদের ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য একটি গল্প মাত্র রচনা করা হইয়াছে।

সূতরাং সমালোচক এই সূক্তটি শুধু পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য অথবা আমি জাতিভেদপ্রথার যে অপকারিতা বর্ণনা করিয়াছি তাহার অসারতা প্রতিপাদনের জন্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট বোঝা গেল না।

লেখকের মতে স্বর্ণবেদের পুরুষসূক্তে প্রচলিত জাতিভেদের দার্শনিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় অর্থাৎ এই সূক্তে রূপকভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে বুদ্ধিজীবী ও ধর্মজীবী লোক স্বভাবতঃই সমাজের শীর্ষস্থান দখল করিবে এই ব্যাখ্যায় আমার কোন আপত্তি নাই — কিন্তু আমার বক্তৃতায় বলার উদ্দেশ্য ছিল — জাতিভেদের সমর্থনকারী এই মত সমাজের উপর বিষময় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই সম্বন্ধে একজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর মত উদ্ধৃত করিতেছি :-

"When the Indians believed that some of them had sprung from the head, some from the arms, some from the thigh, others from the feet, of their Creator and they arranged their society accordingly; they doomed themselves to an IMMOBILITY from which they have not been able yet to recover."

Mazzini - in the Duties of People.

প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ পণ্ডিত Sir Henry Maine বলিয়াছেন :-

"Caste is the most BLIGHTING Institution ever invented by the human mind."

সূতরাং পুরুষসূক্তের জাতিভেদের যে দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহার ভাবনৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া যাওয়া শুধু অসার পাণ্ডিত্যের ভড়ং বই কিছুই নয় - দেখিতে হইবে যে এই মতবাদ সমাজের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সমাজ এই সূক্তকে কিভাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার ফল কি হইয়াছে? সমাজ এই সূক্তের অর্থ গ্রহণ করিয়াছে যে ব্রাহ্মণজাতীয় লোকে বিরাট পুরুষের মুখ হইতে উৎপন্ন, সূতরাং ব্রাহ্মণজাতিভুক্ত প্রত্যেকেই বিরাটপুরুষের পাদ হইতে উৎপন্ন শূদ্রজাতীয় লোকের মাথার উপর পাদপ্রসারণ করার অধিকারী। কিন্তু শূদ্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে সে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য মানিবে না, সূতরাং তাহাকে শাস্ত্রশিক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে। এজন্য খৃঃ এর প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে মনু মহারাজের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে যে শূদ্র যদি বেদ পড়ে, তাহা হইলে তপ্ত সীসা ঢালিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিতে হইবে। গীতায় কৃষ্ণের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে —

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ

এইরূপ জাতিভেদ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচারেও পূর্বোক্ত অনিষ্টকারী মতবাদের কুপ্রভাব কিছুমাত্র খর্ব হয় নাই। পুরুষসূক্তের উল্লিখিত মতবাদ এদেশে লোকে অক্ষয়তা বুঝিয়াছে, তাহার ফলে এতদেশে জাতিভেদ অক্ষয় হইয়া বর্তমান আছে এবং স্বার্থান্বেষীদের স্বার্থসাধনের সুবিধা করিয়া দিয়াছে। এই মতবাদ হইতেই — অস্পৃশ্যতা, বর্ণসঙ্করবাদ ইত্যাদি বহু কুপ্রথা ও কুধারণার উৎপত্তি হইয়াছে।

কিন্তু আমি ব্যাপারটা দেখিয়াছি অন্য দিক দিয়া। আমার মতে এই জাতিভেদপ্রথা হস্ত ও মস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন করিয়া দিয়াছে এবং এইজন্য ভারতে বস্তুতাত্ত্বিক সভ্যতা ইউরোপ-আমেরিকার বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। যিনি বুদ্ধিজীবী, তিনি চিরকাল পুস্তকপুস্তক বিদ্যা, টীকাটিপ্পনী ব্যাকরণদর্শনের তর্ক নিয়া ব্যস্ত আছেন এবং লোককে বিদ্যার দৌড় দেখাইয়া চমক লাগানোই মধ্যযুগের ভারতীয় পণ্ডিতদের আদর্শ ছিল। বস্তবজীবনের সহিত তাহাদের সংশ্রব খুবই কম ছিল। তাহারা শিল্প বাণিজ্যের উৎকর্ষের জন্য কখনও মাথা খাটান নাই। করিলে হয়ত তাহারা জাতিপাত হইত। যিনি যুদ্ধজীবী, তিনি তৎকালপ্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র দিয়া নিজের বীরত্ব দেখাইতেই ব্যস্ত ছিলেন; কখনও এই সমস্ত অস্ত্রের উৎকর্ষ সাধন বা ভিন্নদেশে প্রচলিত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা বা দেশে প্রচলনের চেষ্টা করেন নাই। ফলে বৈদিক যুগ হইতে এতাবৎকাল পর্যন্ত আমরা একই প্রাথমিক চরকাতেই সূতা কাটিতেছি, কাঠের তাঁতে বস্ত্রবয়ন করিতেছি এবং আধুনিককালেও মহাত্মা গান্ধী আমাদের পুনরায় ‘বৈদিক অসভ্যতা’য় ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছেন। বস্ত্রবয়ন, ভূমিকর্ষণ, স্থপতিবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা ইত্যাদিতে বহুকাল হইতে ভারতে নূতন কোন প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয় নাই। ইহার কারণ জাতিভেদপ্রথা অনুসারে মস্তিষ্কের কাজকে খুব বড় করিয়া এবং সমস্ত হাতের কাজকে ছোট করিয়া দেখা — সেজন্য মস্তিষ্ক ও হস্তের যোগসূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আমি আজ প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ প্রাকৃতবিজ্ঞানে শিক্ষাদান করিতেছি এবং ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালী বিষয়েও আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। আমার অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতেছি যে এদেশে ছেলেরা নিজহাতে কার্য করিতে অত্যন্ত নারাজ। আমেরিকায় ছাত্র ও অধ্যাপকগণ নিজহস্তে সূত্রধর, কর্মকার ও অন্যান্য যন্ত্রশিল্পীর কার্য করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়; কিন্তু এদেশে বিজ্ঞানের ছাত্রগণ উক্তরূপ কার্যকে ছোট মনে করে। বুদ্ধিজীবী লোকে যদি নিজহাতে যন্ত্র লইয়া কার্য না করে, তাহা হইলে উক্ত যন্ত্রের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোন নূতন ফন্দী তাহার মাথায় আসিতে পারে না। ইউরোপে এই করিয়াই যান্ত্রিক সভ্যতার বর্তমান উন্নতি হইয়াছে, বুদ্ধিজীবী লোকে পুরাতন যন্ত্র দিয়া কার্য করার অভিজ্ঞতার ফলে এবং যান্ত্রিকেরা বুদ্ধিজীবী লোকের সত্বেবে আসিয়া মাথা খাটাইবার ফলে নব নব উন্নততর যন্ত্র উদ্ভাবন সম্ভবপর হইয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকার যান্ত্রিক সভ্যতার অভূতপূর্ব উন্নতির গোড়ার কথা হস্ত ও মস্তিষ্কের সংযোগ।

বস্ত্রশিল্পের কথাই ধরা যাউক — একজন পণ্ডিত হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে বৈদিক চরকা ও তাঁতের পর বয়নশিল্পে প্রায় ৮০০টি নূতন আবিষ্কার হইয়াছে এবং তাহারই

ফলে বর্তমানে বিরাট বয়নশিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে। এই সমস্ত উদ্ভাবনকর্তাদের মধ্যে Hargreaves ছিলেন নিরক্ষর একজন মজুর, Arkwright ছিলেন penny-barber (অর্থাৎ তিনি এক পেনী নিয়া লোককে কামাইতেন), Cartwright ছিলেন গ্রাম্য পাত্রী। বাষ্পীয় যন্ত্রের (Steam Engine) উদ্ভাবনকর্তা James Watt ছিলেন কর্মকার ও যন্ত্র-সংস্কারক; তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Black এর সংজ্ঞা আশ্রিয়াছিলেন বলিয়াই বাষ্পীয় যন্ত্র উদ্ভাবনে সক্ষম হইয়াছিলেন। সমালোচক বলিয়াছেন

“মানুষ মনোময় জীব; দেহ ও প্রাণ অপরিহার্য হইলেও মনের উৎকর্ষই মানবের উৎকর্ষ। মেঘনাদ বা রবীন্দ্রনাথ কেইই কারিগর নহেন। তাই বলিয়া একজন নিপুণ তাঁতী বা মুচির স্থান তাহাদের উর্ধ্বে হইবে?”

আমার উত্তর — একজন মূর্খ পুরোহিত যে সংস্কৃত মন্ত্রের অর্থ না জানিয়াই শ্রাদ্ধ বা বিবাহের মন্ত্র পড়ায়, তাহার সামাজিক সম্মান তাঁতী বা মুচির অধিক হইবে কেন? তাঁতী বা মুচি পরিভ্রম দিয়া সমাজের একটা বিশেষ কাজ করে, কিন্তু মূর্খ পুরোহিতকে প্রতারক ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? কসাইয়ের ‘ছেলের’ যদি প্রতিভা থাকে, তাহা হইলে ইউরোপে সে Shakespeare হইতে পারিত, কিন্তু এদেশে প্রাচীন প্রথা অনুসারে সে “রবীন্দ্রনাথ” বা “কালিদাস” হইতে পারিত না, হইবার চেষ্টা করিলে ভগবানের অবতার রামচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া তাহার মাথা কাটিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম রক্ষা করিতেন। Bata বা Lloyd George -এর মত মুচি বা মুচির ছেলে প্রতিভা দেখাইলে সমাজে কেন শ্রেষ্ঠস্থান পাইবে না?

অবতারবাদ ও ক্রমবিবর্তনবাদ

হিন্দু অবতারবাদ (Theory of Incarnation) এবং বর্তমান বৈজ্ঞানিক ক্রমবিবর্তনবাদ (Theory of Evolution) এই উভয়ের সমাপ্ত্য করিতে গিয়া সমালোচক আশ্চর্য রকমের গবেষণা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং মাঝে মাঝে জন্মান্তরবাদের (Theory of Transmigration of Soul) সহিত উভয়কেই ওলাইয়া ফেলিয়াছেন।

“আশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে পেয়েছে মানব জীবন রে।”

একথা নিছক জন্মান্তরবাদ এবং ইহার ছল মর্ম এই যে, কোন মানুষ পাপ করিলে তাহার নীচ যোনিতে জন্ম হয় এবং বহুলক্ষ্যের নীচ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া পাপের অবসান হইলে সেই আত্মা পুনরায় মানুষ দেহে জন্মগ্রহণ করে এবং মুক্তিলাভের সুযোগ পায়।

ইহার সহিত পাশ্চাত্য Theory of Evolution-এর সামঞ্জস্য সমালোচকের নিজস্ব আবিষ্কার; কারণ শশধর তর্কচূড়ামণি, যিনি হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন অণুজোয়ার সমুদ্র শোষণ কাহিনীকে Electrolysis বলিয়াছিলেন, তিনিও এতবড় আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই।

আশ্চর্যের বিষয় এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই সমালোচক এক লক্ষ্যে অবতারণা করে পৌছিয়াছেন। তাহার মতে হিন্দু অবতারণা পাশ্চাত্য Theory of Evolution-এর মূলতত্ত্ব নিহিত আছে। সমালোচকের মত গ্রহণ করিলে বেচারার Darwin নেহাৎ ভাবচোর বই নন।

কিন্তু নিরপেক্ষ পাঠক একটু পড়িলেই দেখিবেন যে, সমালোচকের Theory of Evolution-এর জ্ঞান প্রায় নাই বলিলেই হয়; ইহা মাজনির, কারণ তিনি পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের সহিত সম্ভবতঃ অপরিচিত। কিন্তু আমি দেখাইতেছি যে অবতারণা সন্দেহও তাহার জ্ঞান ভ্রান্তিপূর্ণ।

জন্মান্তরবাদে যাহার বিশ্বাস করিবার ইচ্ছা আছে, তিনি করিতে পারেন, আমি নিজে ইহাতে মোটেই বিশ্বাস করি না। কারণ জন্মান্তরবাদের কোনও বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ (প্রত্যক্ষ বা আনুমানিক) আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আমার বিশ্বাস যে প্রাচীন ভারতে একশ্রেণীর নীতিকারগণ সাধারণ লোককে সংপথে রাখার জন্য যেরূপ স্বর্ণ-নরক প্রভৃতি কল্পনিক জগতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তেমনি অন্য শ্রেণীর নীতিকারগণ (প্রধানতঃ বৌদ্ধগণ) জন্মান্তরবাদ সৃষ্টি করিয়াছেন।

কিন্তু ক্রমবিবর্তনবাদ (Theory of Evolution) সুপরিদৃষ্ট আবিষ্কার ও সুপরিষ্কৃত মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার পশ্চাতে বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক সংগৃহীত পৃথিবীর অতীত যুগের সহস্র সহস্র প্রাণীদেহাবশেষের আবিষ্কার রহিয়াছে। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে এই সমস্ত আবিষ্কারকে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে, বাদ ও বিচার দ্বারা তাহাদের পৌর্বাপর্য্য প্রমাণিত করা হইয়াছে এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সুপরিষ্কৃত নিয়ম দ্বারা, প্রত্যেক জীবযুগের

সময় নির্ধারিত হইয়াছে — Darwin-এর সিদ্ধান্তে যে সমস্ত ক্রটি বা অপূর্ণতা ছিল, Mendelism-এর সাথে যে সমস্ত অসামঞ্জস্য ছিল, তাহাও অনেকটা সমাধান হইয়া আসিয়াছে। এই তত্ত্বের সহিত জন্মান্তরবাদের সাদৃশ্য নেহাৎ কল্পনালোকপ্রবাসী ব্যতীত কেহ ধারণাও করিতে পারেন না।

অবতারণাদের মূলসূত্র সন্দেহে কৃষ্ণের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে —

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় চ সন্তবামি যুগে যুগে।

অর্থাৎ ভগবান নিজে সাধুদের পরিভ্রাণের জন্য এবং দুষ্কৃতদের বিনাশের জন্য যুগে যুগে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার সহিত পাশ্চাত্য ক্রমবিবর্তনবাদের সন্দেহ আছে, নেহাৎ গায়ের জোর ছাড়া একথা কেহ বলিতে পারেন না। উক্ত মতে অতি প্রাচীন যুগে প্রায় ৫০০ কোটি বৎসর পূর্বে খুব নিম্নস্তরের জীব পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়, তৎপরে পর পর মৎস্য, সরীসৃপ, পক্ষী, স্তন্যপায়ী জন্তু এবং সর্বশেষ বানর ও মানুষের ক্রমবিবর্তন হয়। ইহার মধ্যে ভগবানের কোন কথাই নাই; সমালোচক ক্রমবিবর্তন সন্দেহে কি পুস্তক পড়িয়াছেন জানিনা; কিন্তু কেন পাশ্চাত্য পুস্তকে লিখিত আছে যে এককালে এই পৃথিবীতে অর্ধ-মানব অর্ধ-সিংহ জানোয়ারের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল?

কোন পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন যে এককালে মানুষ বানর অর্থাৎ অতি হুংকার ছিল। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে মানুষ Pleistocene যুগে নরাকৃতি বানর হইতে মস্তিষ্ক এবং অন্যান্য অঙ্গের ক্রমোৎকর্ষবশতঃ বর্তমান মানুষ (Homo Sapiens) পরিবর্তিত হইয়াছে। এই বিবর্তনের স্তরে স্তরে অনেক রকম মানবের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, যেমন Peking Man, Java Man, Neanderthal Man, Cro-magnon Man ইত্যাদি, কিন্তু তাহারা কেইই আকারে বানর ছিল না। তাহার পর ক্রমবিবর্তনবাদের সহিত সভ্যতার আধ্যাত্মিক বিকাশের একত্রীকরণ করিয়া গিয়া সমালোচক নানারকম অবাস্তব প্রণালীতে অবতারণা করিয়াছেন। তিনি মানবসমাজের সভ্যতার ইতিহাসও জ্ঞানেন না এবং হিন্দুর অবতারণাদেও সম্যক অবগত নহেন। তিনি লিখিয়াছেন, “একযুগে মানুষ সভ্যতার উন্নতি করে, সেইটাই সত্যযুগ। ক্রমশঃ তাহার অবনতি হয়, তাহাকে কলিযুগ বলা হয়।”

১. Science and Culture প্রবন্ধ

২. জ্যোতিষিক প্রমাণদ্বারা Jacobi ও Tilak কথনকেন কোন কোন অংশকে ৪০০০ বৎসরের পুরনো বলিয়াছেন; কিন্তু উহা হইতে সভ্যতার তুলনামূলক উৎকর্ষ সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যায় না। শুধু ঐ সভ্যতা পাঞ্জাব হইতে পারস্য পর্যন্ত ভূভাগে বিস্তৃত ছিল মনে হয়। কিন্তু এই সুপ্রাচীনকালেও প্রাচীন মিশর, মেসোপটেমিয়া ও ভারতে সভ্যতার সবিশেষ উৎকর্ষ হইয়াছিল ইহার প্রমাণ আছে।



Maharashtra : 2001 - Times of India

বৈদিক সমাজে নারীর স্থান

সুকুমারী ভট্টাচার্য

মাকে মাঝেই বক্তৃতায় বা বেতারে শুনি, প্রবন্ধে বা বইয়ে পড়ি প্রাচীন ভারতবর্ষে নারীর স্থান খুব উঁচুতে ছিল, মুসলিম আক্রমণের পরই নাকি নারীর স্থান সমাজে নেমে যায়। এসব মন্তব্যের সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য আমাদের হাতে তথ্য আছে সাহিত্যে। একেবারে প্রাচীন অর্থাৎ বৈদিক যুগেই নাকি নারীর স্থান খুব উঁচুতে ছিল। বৈদিক সাহিত্য ছাড়া তো সে যুগের কোনো ইতিহাস পৌঁছয়নি আমাদের কাছে, কাজেই সেই সাহিত্যে থেকেই খোঁজ করতে হবে সত্যিসত্যি কতটা উঁচুতে স্থান ছিল নারীর, এ প্রবন্ধে সেই অনুসন্ধানের চেষ্টা।

বৈদিক যুগ বলতে যে যুগে বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়েছিল তাই বুঝতে হবে। এ সাহিত্য প্রধানত সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও সূত্রসাহিত্য অর্থাৎ শ্রৌত, গৃহ্য, বর্মসূত্রই প্রধানত। আধুনিক সমস্ত পণ্ডিতই প্রাচীনতম বেদ অর্থাৎ ঋগ্বেদকে খ্রীস্টপূর্ব দ্বাদশ শতক থেকে দশমের শেষ বা নবমের শুরুর রচনা বলে মনে করেন। যজুর্বেদ ও সামবেদ এবং প্রাচীন ব্রাহ্মণগুলি খ্রীস্টপূর্ব নবম থেকে সপ্তম শতকের। অথর্ববেদের প্রাচীনতম অংশও এই সময়ের; বাকি অংশ ও পরবর্তী ব্রাহ্মণ ও উপনিষদগুলি খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠম থেকে পঞ্চম শতকের রচনা। সূত্রসাহিত্য সম্ভবত খ্রীস্টপূর্ব দ্বাদশ থেকে খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতক এই দেড়হাজারের কিছু বেশি সময়ের সাহিত্যে সমাজের যে চিত্র সংগ্রহ করতে পারি তারই মধ্যে বুঝব নারীর স্থান। বলাই বাহুল্য, এর শেষ হাজারখানের বছরের প্রাচীন সাহিত্য ছাড়াও অন্য উৎস আছে, যেমন প্রত্নতত্ত্ব, শিলালিপি, তাম্রশাসন, মহাকাব্যাদি। প্রাচীন যুগের পুরাণ, বৌদ্ধ সাহিত্য ইত্যাদি।

নারী-নারী পণ্ডারী আর্যরা এল উত্তরভারতে যেখানে ‘সিন্ধুসভ্যতা’ প্রতিষ্ঠিত ছিল, এরা ক্রীতদাসী-নারী-নগরসভ্যতার যুগে বাস করত, ধাতুর দিকে যুগটা ছিল ব্রঞ্জ যুগ। ইতিহাসের বাস্তবতা বোঝার আর্যদের সঙ্গে লোহা ঢোকে ভারতবর্ষে। সম্ভবত ইন্দ্রের বজ্র, যার প্রভাবে বৃন্দ, অর্থাৎ আর্যদের সেনাপতি প্রজার্যদের হারালেই সেটা ছিল লোহার ফলকমুক্ত ভারতের স্বাধীন সামনে প্রজার্যদের নরম ধাতুর অগ্রদাঁড়াতে পাবেনি। এছাড়াও আর্যদের

ছিল ঘোড়ায় টানা রথ, প্রাণার্যদের হাতি তার মত দ্রুতগামী নয়। প্রাণার্য সিদ্ধুসভ্যতার সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের যে বহিবাণিজ্য সম্পর্ক ছিল, আর্যরা আসবার পরেই তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আবার দু-তিনশ বছর পরে শুরু হয়।

যাযাবর পশুচরী আর্যরা এদেশে এসে ধীরে ধীরে এদের পরাজিত করে প্রায় সমস্ত আর্ষবর্ত অধিকার করে। প্রাণার্যদের সঙ্গে বিয়ে ও প্রতিবেশিত্বের মধ্যে দিয়ে আর্যরা ক্রমে ক্রমে চাষ করতে শেখে ও যাযাবর থেকে গ্রামীণ মানুষ হয়ে ওঠে। পোড়া ইট দিয়ে বাড়ি তৈরি করতে শেখে ও 'বিত্ত' হয়ে একজায়গায় বসবাস করতে থাকে। যাযাবরদের সমাজসংস্থা ছিল গোষ্ঠী (tribe) ও কৌমে (clan) বিভক্ত। এ সমাজগঠন ধীরে ধীরে ভাঙতে থাকে, কৃষি শিখে কৃষিজীবী হবার পর। ক্রমে ক্রমে 'কুল' এর প্রবর্তন হয়, অর্থাৎ একটা বাড়িতে তিন চার পুরুষের পুরুষের বৃহৎ পরিবার। তারপর আসে বৌদ্ধ পরিবার, পুরুষের সম্পর্ক ধরে দু-তিন পুরুষের পরিবার, সবশেষে একক পরিবার, এক পুরুষের সংসার। এসবের সঙ্গেই উৎপাদন ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, কিন্তু একটি ব্যাপার এমশ পরিণতির দিকে এগোচ্ছিল; সমাজে শূদ্র ও নারীর স্থানের অনিবার্য অবনমন, অর্থাৎ ক্রমেই নারীর স্থান সমাজে ও পরিবারে নেমে যাচ্ছিল। উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর অংশ ক্রমেই করে যাচ্ছিল, যদিও গৃহকর্মে তার পরিশ্রম ও দায়িত্ব যথেষ্টই ছিল তবু তাকে 'ভাৰ্য্য' অর্থাৎ অন্যের দ্বারা ভরণীয়া, স্বামীর সঙ্গে প্রতিপালিত এই সংজ্ঞা দেওয়া হল। মনে রাখতে হবে ভৃত্য আর ভাৰ্য্য এই শব্দদুটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ একই : যাকে ভরণ করতে হয়। স্ত্রী স্বয়ং অন্ন উৎপাদন করে না তাই সে ভরণীয়া। [ইংরেজিতে মধ্যযুগ পর্যন্ত স্বামীকে লর্ড বলা হত; এই শব্দও স্ত্রী ও ভৃত্যের উভয়ের পক্ষে একই, এবং এরও ব্যুৎপত্তি hlaf ward থেকে, অর্থাৎ অন্নের (hlaf, loaf/রুটি) জন্যে যার কাছে লোক আশ্রিত (ward)]

বৈদিক যুগের শেষ দিকে অনেক বৈদেশিক আক্রমণ হয় তার ফলে নারীহরণ ও বর্ষসংকরের আশঙ্কায় নারীকে অন্তঃপুরে ঠেলে দেওয়া হয় ও তখন থেকে নারী অনেক বেশি অসুর্ষস্পশ্য হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ঘরে-বাহিরে যখন যেখানে কোনো বিপত্তি দেখা দিয়েছে তার দামটা দিতে হয়েছে শূদ্র ও নারীকে। নারীর ক্ষেত্রে সেটা কেন এবং কেমন করে ঘটল তাই দেখব এ প্রবন্ধে।

ঋগ্বেদ হল বৈদিক সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ। এখানে সরাসরি নারীর স্থান সম্বন্ধে বিশেষ কোনো উক্তি নেই, কিন্তু নানা বর্ণনা উপমান থেকে নারীর স্থান সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। ঋগ্বেদের রচনায় কয়েকটি স্তর আছে, তার প্রথম স্তরের মন্ত্রগুলিকে নারী অপেক্ষাকৃত

স্বাধীনচরিত্রী। দেবী উষা কোনো মন্ত্রে সূর্যের বধু, কোথাও মাতা, কোথাও কন্যা; রচয়িতাদের কল্পনার প্রকারভেদে। কখনো বলা হচ্ছে, উষা নির্লজ্জা নারী; বিশ্বজনের দৃষ্টির সামনে আপন দেহাঙ্গী উদঘাটন করছে। [ঋগ্বেদ ১/৪৬/৪] কখনো বা শুনি উষা স্মিতহাসিনী; নববধু যেমন করে স্বামীর সামনে নিজেকে প্রকাশ করে, উষা তেমনি করেই নিজের আবরণ উন্মোচন করছে। [ঐ ১/১২৪/৭] সুন্দরী সুসজ্জিতা উষার দেহটি যেন মায়েব নিজের হাতে স্নান করিয়ে দেওয়া ও সাজিয়ে দেওয়া কন্যার দেহটি। [১/১২৩/১২] শুনতে পাই, অগ্নি তেমনি করে স্তোতার স্তবে খুশি হন যেমন করে প্রেমিক স্বামী তার বধুর সান্নিধ্যে আনন্দ পায়। [৩/৮২/৮] অগ্নি তেমনি পবিত্র যেমন পবিত্র স্বামীর দ্বারা সম্মানিতা বধু। [১/৭৩/৩] দেখা যাচ্ছে, দেবতার আনন্দ, দেবতার পবিত্রতার উপমান মানবের প্রেম, মানবীর গুণিতা। এই যুগেই শুনি নারী নিজেই তার জীবনসঙ্গী বেছে নেয়। [স্বয়ং সা মিত্রং বনুতে জনে চিৎ ১০/২৭/১২] আবার একটু পরের যুগে শুনি, প্রিয়া সুখী হও। [তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২/৪/৬/৫৬] বহুবার একটি উপমা পাই, উপাসক তাঁর দেবতার কাছে আসছেন যেমন করে কোনো পুরুষ তার কাম্য নারীর কাছে আসে বা তার পেছনে পেছনে যায়। [মর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ, ঋগ্বেদ ৭/৮০/২, আরও অনেক জায়গায় এই ধরনের কথা আছে।] ঘৃতধারা সোমের দিকে ধাবিত হচ্ছে যেমন করে অলংকৃত সুন্দরী তরুণী স্বামীর কাছে যায়। [ঐ ৪/৫৮/৯]

যাকে বলা হয় অবৈধ প্রণয় তা নিয়ে ঋগ্বেদের ঋষির কোনো কুষ্ঠা নেই, অনাদিকাল থেকেই তা সকল সমাজেই আছে। তাই তা যেন সর্বজনস্বীকৃত একটি সামাজিক তথ্য। সেইজন্য, 'জারো ন', উপপত্তির মত, এই উপমাটি বায়েবারেই পাই। যমযমী সূক্তে [১০/১০] ভাইবোনের ও নাভানেদিষ্ট সূক্তে [১০/৬১/৫-৭] পিতাপুত্রীর আসক্তির কথা আছে, নাভানেদিষ্টে মিলনের উল্লেখও আছে, অর্থাৎ প্রচলিত সমাজনীতির ব্যতিক্রম। নিষিদ্ধ সম্পর্কের মিলন, এ-ও সমাজে মধ্যে মধ্যে দেখা যায় বলেই ঋগ্বেদের ঋষিও অকুণ্ঠভাবেই এর উল্লেখ করেছেন। সোম যজ্ঞপাঠের দিকে যাচ্ছে যেমন কামুক তার বন্ধুপত্নীর দিকে যায়। [৯/৯৬/২২, ২৩; ১০১/১৪] নদীরা বিশ্বামিত্রের দিকে যাচ্ছে যেমন করে চূষনে উদ্যত পুরুষের কাছে নারী আনত হয়। [৩/৪৫/১] সোমরস বসন্তবীরর বলে আনন্দিত হয় যেমন উত্তম নারীর সান্নিধ্যে পুরুষ আনন্দিত হয়। এমনি অসংখ্য দৃষ্টান্তে নারীপুরুষের প্রেম ও মিলনের অসংকোচ উল্লেখ উপমানে।

নারীর ইচ্ছাক্রমে বা অনিচ্ছাক্রমে নারীহরণের কথাও ঋগ্বেদে মধ্যমধ্যে আছে। পান্ডিত্যের কন্যাকে বিমদ হরণ করছেন। [১/১১২/৭; ১১৬/১] কোনো পুরুষ রাগে

একটি নারীকে হরণ করতে যাবেন তাই প্রার্থনা করছেন, মেয়েটির ভাইয়েরা যেন জেগে না যায়, কুকুরগুলো যেন না ভেঙে ওঠে। [৭/৫৫/৫-৮]

বিবাহে কন্যাপণের কথা পাওয়া যায়। ইন্দ্র আর অগ্নি ভক্তিকে ধন দেন, অবান্ত্রিত জামাতা যেমন প্রচুর ধন দিয়ে স্বশুরবাড়ির লোকদের অনুকূল করে তাদের খ্রীতিভাজন হয়। [১/১০৯/২] পুরুষের বধুপত্নীদের কথা কখনো স্পষ্টত [৭/২৬/৩] কখনো বা গোপনভাবে, সপত্নীনাশের মন্ত্রগুলির দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। কন্যার শরীরে ক্রটি থাকলে বরপণের কথা আছে একাধিকবার। [৬/২৮/৫, ১০/২৭/১২] কুমারী কন্যার কথাও বেশ কয়েকবার আছে। এদের কলা হত অমাজু বা অমাজুরা, অর্থাৎ যারা বাপের বাড়িতেই বুড়ো হয়ে যায়; বিধবা কুলপা বা বা কুলকুমারী বা জরৎকুমারী। [১/১১৭/৭; ১০/৩৯/৩; ১০/৪০/৫] পরবর্তীকালে বিবাহ যেমন নারীর পক্ষে বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছিল, ঋগ্বেদের যুগে দেখছি তা ছিল না। ঋগ্বেদে সহমরণ, পরবর্তীকালে যাকে সতীদাহ বলা হয়েছে, তার কোনো উল্লেখ নেই; বিধবা বেঁচেই থাকত, কখনো বা দেওরের সঙ্গে বিয়ে হত তার, আর কখনো-বা আর বিয়ে হতই না। সে যাই হোক তার বেঁচে থাকার অধিকারটুকু কেড়ে নেওয়া হয়নি, পুড়িয়ে মারাও শুরু হয়নি ধর্ম বা সমাজের দোহাই পেড়ে। দ্বিতীয়বার বিয়ের — দেওর ছাড়া অন্যকেও — অধিকারও স্বীকার করা হয়েছিল, কিন্তু পরেই তার প্রমাণ দেখতে পাব। বেদ রচনার উত্তরপর্বে অর্থাৎ ঋগ্বেদের প্রথমার্ধ রচনার পরে প্রাগার্য প্রভাবেই হোক বা অন্য কোনো কারণে সামাজিক বিবর্তনের ফলেই হোক প্রথম সহমরণের কথা শুনি অর্থর্ববেদে। সেখানে একজায়গায় শুনি “দেখলাম জীবিত নারীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মৃতের বধু হতে”। [অর্থর্ববেদ ১৮/৩/৩] কিংবা অন্যত্র “এই নারী পতিলোকে যাচ্ছে, এ প্রাচীন রীতি অনুসরণ করছে”। [১৮/৩/১] প্রশ্ন থেকেই যায়, এ প্রাচীন রীতি আর্য না প্রাগার্য; কারণ ইন্দো-ইয়োরোপীয় অন্য সভ্যতাগুলিতে সহমরণের কথা পাই না। এ প্রথা কত প্রাচীন? প্রাগার্য সিদ্ধুসভ্যতার? বিধবা বেঁচে থাকলেই সবসময় তার জীবন সুখের হত না, তাই প্রার্থনা শুনি, “যেন ইজ্রানীর মত অবিধবা হই”। [তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩/৭/৫/৫১]

বলা বাহুল্য, সমস্ত ভারতীয় সাহিত্যে ‘যেন বিপত্নীক না হই’ এমন প্রার্থনা কোথাও নেই। বরং এখন এর উল্টো কথাই শোনা যায়, ‘ভাগ্যবানের বউ মরে, অভাগার গোরু’। সম্পত্তি হিসেবেও স্ত্রীর স্থান গোরুর নীচে, কারণ নতুন গোরু কিনতে টাকা লাগে, আর নতুন বৌ আনলে টাকা পাওয়া যায়।

এই উত্তর-বৈদিক যুগে নারীর বহু বিবাহের কথাও শোনা যায়। অর্থর্ববেদে শুনি, “যে

নারীর পূর্বে একজন পতি ছিল সে যখন দ্বিতীয় পুরুষকে লাভ করে তখন অজ্ঞ দান করলে তার কোনো ক্ষতি হয় না।” [৯/৫/২৭] অন্যত্র শুনি, “কোনো নারীর দশটি পতি থাকলেও সে যখন ব্রাহ্মণের পত্নী হয় তখন সেই ব্রাহ্মণই তার পতি, রাজন্য বা বৈশ্য পতির পতি নয়।” [৫/১৭/৮, ৯]

এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য অবশ্য ব্রাহ্মণ পুরুষের মাহাত্ম্য ঘোষণা করে, অন্য বর্ণের হীনত্ব প্রতিপাদন করা।

কিন্তু প্রসঙ্গত কোনো নারীর পক্ষে দশটি স্বামী গ্রহণের স্বীকৃতিও এতে আছে।

যজুর্বৈদের যুগেই আর্য প্রাগার্য সংমিশ্রণের স্পষ্ট চিহ্ন পড়েছে সাহিত্যে। অবশ্য ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথমার্ধ ও দশমমণ্ডলেই এর সূত্রপাত। ততদিনে আর্যরা গ্রামীণ ও কৃষিজীবী, পোড়া ইটের ঘরবাড়ি তৈরি করছে, জনপদে, গ্রামে ও পুর বা শহরে বাস করছে। নানা বৃত্তি অবলম্বন করছে। সমাজে জটিলতা বেড়েছে, গোষ্ঠী ও কৌম ভাঙছে ধীরে ধীরে, যৌথ ও বৃহৎ পরিবারেই সমাজের ন্যূনতম সংগঠন দেখা দিচ্ছে। বহিঃগণিত শুরু হয়েছে, ধনসম্পত্তি বাড়ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞের সংখ্যা ও জটিলতা, পুরোহিতের সংখ্যা ও দক্ষিণার পরিমাণ চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়ছে। এই সময়ে শুনি “যজ্ঞমান দীক্ষার দিনে গণিকাসাহচর্য বর্জন করবেন, তার পরদিন পরস্ত্রীর এবং তৃতীয় দিনে নিজের স্ত্রীর”। [তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬/৬/৮/৫] অর্থাৎ দীক্ষার দিনেও পরস্ত্রীর সাহচর্য নিষিদ্ধ ছিল না এবং গণিকাগমনের জন্য দীক্ষার দিনে কোনো প্রায়শ্চিত্ত ছিল না।

যজ্ঞে যজ্ঞমানের পত্নী পাশে থাকতেন কিন্তু নিষ্ক্রিয়ভাবে। তাঁর উপনয়ন নেই, অতএব “ন স্ত্রী জুহুয়াৎ” নারী, হোম করতে পারবে না। [অপস্তম্ব ধর্মসূত্র ২/৭/১৫/১৭] অথচ অন্যত্র বারবারে শুনি, “পূর্বার্ধে বৈ যজ্ঞস্যাক্ষর্যুর্জথনার্ধং পত্নী” [শতপথব্রাহ্মণ ১/৯/২/২; ৩/৪/২২; ৫/২/১-১০] অর্থাৎ যজ্ঞের পূর্বার্ধ যজ্ঞমান, উত্তরার্ধ যজ্ঞমানপত্নী। কিন্তু এই অপরাধটি যজ্ঞে কোনো অংশগ্রহণ করত না; শুধু পাশে বসে থাকত। এতটাই নিষ্ক্রিয় তার ভূমিকা, যে রাম সোনার সীতা গড়িয়ে নিয়ে যজ্ঞ নিষ্পাদন করতে পেরেছিলেন। গৌতমধর্মসূত্রে শুনি “অস্বতন্ত্রা ধর্মে স্ত্রী” [১৮/১] ; অর্থাৎ ধর্মচরণে নারীর কোনো ষাও নেই।

গৃহকর্ম ভিন্ন কোনো বৃত্তি কুলনারীর ছিল না। যে দু’একটি কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তার মধ্যে আছে পশম পাকানো ও বোনা, [শতপথব্রাহ্মণ ১২/৭/২/১১], অন্যান্য গাছের সঙ্গেই এটি করত তারা। মেয়েদের শিক্ষার প্রসঙ্গে দেখি ব্রহ্মচর্য, যা বেদ অধ্যয়নের পোশাদার, তা বহু প্রাচীন যুগেই নারীর পক্ষে নিষিদ্ধ, অতএব শিক্ষালাভের পথ তার

রুদ্ধ। অথর্ববেদ বলে, ব্রাহ্মচর্যের দ্বারা নারী স্বামী লাভ করে [১১/৫/১৮] ; মনে হয় এ ব্রাহ্মচর্য কোনো ব্রত, বা শিবপূজার মতই কিছু, স্বামীলাভই যার উদ্দেশ্য। স্বধেদে কিছু অধিকার নাম পাই, হয়ত তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ শিক্ষাভার সুযোগ পেতেন; যেমন বিশ্ববারা, ঘোষা, অপালা, গোধা। পাণিনিতে আচার্য্য, উপাধ্যায় শব্দের ব্যুৎপত্তিতে অধ্যাপনায় রত নারীর উল্লেখ আছে; কশিকাবাস্যে কাশকৃত্তা ও অপিশলার নাম পাই মীমাংসা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত বলে; অঙ্গুণ স্বধির কন্যা বাক্ গার্গী, মৈত্রেয়ী, শাম্বতী এঁদের কথাও পাই। অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে ব্যতিক্রমের মত কোনো কোনো নারী শিক্ষার সুযোগ পেতেন। কিন্তু শাস্ত্রের নজির দেখলে বোঝা যায় নারীর শিক্ষার অধিকার ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছিল। তাই শিক্ষিতা নারীর প্রসঙ্গে বলা আছে, “দ্বিঃ সতীঃ তা উ যে পুংসঃ আঙ্কঃ” [তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১/১১/৪] অর্থাৎ নারী হয়েও তারা পুরুষ। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের যুগ থেকে শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়, ক্রমে যে অবস্থা দাঁড়াল তাতে গণিকা ছাড়া শিক্ষাতে আর কোনো নারীর অধিকার ছিল না। অনুমান করা যায় হয়ত সঙ্গীত নৃত্য ও চিত্রশিল্পে কিছু কিছু কুমারীর অধিকার ছিল, কিন্তু অন্যান্য বিদ্যা থেকে সাধারণভাবে সে বঞ্চিতই ছিল। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই ছিল; বৃহদারণ্যক উপনিষদে পণ্ডিত কন্যা পাবার জন্যে পিতামাতার আচরণীয় অনুষ্ঠানের কথাও আছে [৬/৪/১৩] ; কিন্তু সে ব্যতিক্রমই।

সোমযাগের একটা পূর্বে যজ্ঞের কয়েকটি পাত্রকে মাটিতে রাখা হয় বাকি কয়েকটিকে ওপরে তুলে ধরা হয় ; এ প্রসঙ্গে শুনি, “সেইজন্য সন্ধ্যোজাত শিশুকন্যাকে মাটিতে রাখা হয়, শিশুপত্রকে তুলে ধরা হয়”। [তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬/৫/১০/৩] সমাজের নারী জন্মাবধি এই স্থানই পায়; পুরুষের নিচে।

পুরুষের বহুবিবাহ স্বধেদের যুগ থেকেই চলে আসছে, তবে স্বধেদের সময়ে নারীরও বহুপতিত্ব অধিকার ছিল, যদিও এ অধিকার সে অল্প কিছুকালের মধ্যেই হারায়। তৈত্তিরীয় সংহিতা ও ব্রাহ্মণে পড়ি, “যজ্ঞে একটি দণ্ডকে বেঁটন করে থাকে দুটি বস্ত্রখণ্ড; তাই পুরুষ দুটি স্ত্রী গ্রহণে অধিকারী; একটি বস্ত্রখণ্ডকে দুটি দণ্ড বেঁটন করে না, তাই নারীর দ্বিপতিত্ব নিষিদ্ধ”। [তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬/৬/৪/৩ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১/৩/১০/৫৮] অন্যত্রও শুনি, “একস্য পুংসো বহো জায়া ভবন্তি,” [শতপথ ব্রাহ্মণ ৯/৪/১/৬] এক পুরুষের বহু পত্নী হয়। বলা বাহুল্য এই ধরনের শাস্ত্র হেতুনির্ণয়ের ছলে যজ্ঞের বিধিবিধানের দোহাই পাড়লেও আসলে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমাজের প্রচলিত কিছু আচরণের শাস্ত্রীয় সমর্থন জোগানো, এবং এ ধরনের ব্যাখ্যায় শুধু পুরুষের পক্ষে সুবিধাজনক আচরণেরই সমর্থন পাওয়া যায়। সম্ভবত পূর্ববর্তীকালে প্রচলিত নারীর বহুপতিত্ব এসময়েই নিষিদ্ধ হতে শুরু

হয়, তাই আপাত-যুক্তির মত এক যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানের অনুপূঙ্খকে হেতুরূপে উপস্থাপিত করা হল। এখানে পুরুষের দুটি স্ত্রী গ্রহণের কথা বলা থাকলেও কার্যত পুরুষের বহুবিবাহের অনেক নিদর্শন দেখতে পাই [স্বধেদ ৭/২৬/৩]। রাজাদের তো বৈধ পত্নীই চারটি থাকত যজ্ঞবেদের আমল থেকেই—মহিষী, বাবাতা, গরিবন্তি (বা পরিবন্তী) ও পালাগনী। এ ছাড়াও বহু উপপত্নীও থাকত রাজ-অন্তঃপুরে। মৈত্রেয়ণী সংহিতায় দেখি মনুর দশটি ও চন্দ্রের সাতাশটি স্ত্রীর উল্লেখ আছে। বহু স্ত্রী থাকলেও তাদের প্রতি সমদর্শিতা নাকি প্রত্যাশিত ছিল, তাই চন্দ্র রোহিণীর প্রতি বেশি অনুরক্ত ছিলেন বলে তাঁর যক্ষ্মা হয়, সেইজন্যে যক্ষ্মার অন্য নাম ‘জায়েন্য’। [তৈত্তিরীয় সংহিতা ২/৩/৫/১-৩] বিবাহে কন্যাকে দান করা হত স্বামীকে নয়, স্বামীর পরিবারকে; “কুলায় হি স্ত্রী প্রদীয়তে”। [আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ২/১০/২৭/৩] যার কুফল আজও প্রতিদিন খবরের কাগজে দেখা যায়—শ্বশুর শাণ্ডি নন্দ ভাসুর দেওর সকলে মিলেই বধূকে যে নির্যাতন করে সে তো এই অধিকারেই।

“নারী পুরুষের অপরাধ” গুনলেই মনটা উল্লসিত হয়ে ওঠে, কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয়। কারণ পরের অংশটা হল, “সেজন্য যতক্ষণ সে বধূলাভ না করে ও সন্তান না আসে ততক্ষণ পুরুষ অসম্পূর্ণ”। [তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬/১/৮/৫] অর্থাৎ সন্তানজন্মের জরুরী প্রয়োজনেই নারী, মানসিক বা সামাজিক কোন সংজ্ঞায় নয়। স্বধেদে সন্ধ্যোবধূকে আশীর্বাদ করা হচ্ছে, “শ্বশুর শাণ্ডি দেবর ননান্দা সকলের সম্রাজ্ঞী (বা অধীশ্বরী) হয়ো।” [১০/৮৫/৪৬] প্রথমত, বধূটির বাস্তবজীবনে সম্রাজ্ঞীত্ব দুর্লভ ছিল বলেই এ আশীর্বাদ। দ্বিতীয়তঃ পরবর্তী অসংখ্য শাস্ত্রবচনে এর খণ্ডন আছে।—তাই অথর্ববেদে পড়ি, “সূর্যোদয় হলে প্রেত তেমন করে ছুটে পালায় যেমন করে পূত্রবধু শ্বশুরের সামনে থেকে ছুটে পালায়”। [৮/৬/২৪] কোন্ সম্রাজ্ঞী প্রজার সামনে থেকে কবে এমন করে ছুটে পালিয়েছে? উত্তম নারীর সংজ্ঞা হল, “যে স্বামীকে সন্তুষ্ট করে, পুত্রসন্তানের জন্ম দেয় এবং স্বামীর কথার ওপরে কথা বলে না”। [ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩/২৪/২৭; পরবর্তীকালে এমনই কথা দেখি আপস্তম্বধর্মসূত্রে ১/১০/৫১-৫৩] এ ছবি আর যাই হোক, কোন্ পালেও কোনো সম্রাজ্ঞী বা অধীশ্বরী নয়; বরং দীনতম প্রজার বা দাসীর, যে পুরুষ-প্রভুর ভয়ে সংকোচে নেপথ্যচারিণী।

বিবাহের সবকিছু মন্থেই উদ্ভরণ করে বলা হয় স্ত্রী যেন চিন্তায় ও কাজে স্বামীর অনুবর্তিনী হয়, স্বামীর চিন্তের অনুগামিনী হয়; কোথাও বলা নেই, স্ত্রীরও চিন্তা বলে একটা কিছু আছে না-ও স্বামীকে তার প্রতি অনুকূল হতে হবে। মধ্যে মধ্যে শোনা যায়, সুন্দরী বধু স্বামীর গেম লাভ করে [শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩/১/৯/৬] এতে বধূকে সেহমাত্রসার করে দেখা হয়

এবং তার যে অন্য কোনো আকর্ষণ থাকতে পারে সেকথা শাস্ত্রে কোথাও স্বীকৃতি পায়নি। সহজেই বোকা যায়, সুন্দরী বধূরও রূপযৌবনে একদিন ভাঁটা পড়ে, তখন স্বামীর প্রেমে সে অধিকার হারায়। তাছাড়া ভাঁটা পড়বার আগেও সুন্দরীতরা নারী স্বামীর চোখে পড়লে তাকে এনে স্বামী পূর্ববর্তিনীর মর্যাদা খর্ব করে। তাই সপত্নীবিনাশের জন্য, স্বামীর একনিষ্ঠ প্রেম পাবার জন্য বা স্বামীকে বশীভূত করার জন্য বহুতর অভিচারক্রিয়ার মন্ত্র দেখতে পাই ঋগ্বেদে ও অথর্ববেদে। এ বিপদ সেদিনের নারীর কাছে কত ভয়াবহ রকমে বাস্তব ও সর্বনাশা হয়ে দেখা দিত আজ তা কল্পনা করাও কঠিন।

নারীর স্থান ক্রমেই অস্তঃপুরের গহন সরে গেছে। যদিও ঋগ্বেদে যোদ্ধা নারী মুদগলিনী, বিশ্ণুলা, বক্রিমতী, শশীরসীর কথা পড়ি, যাদের কেউ যুদ্ধে আহত কেউবা যুদ্ধে বিজয়িনী। তবুও ঋগ্বেদের প্রথম যুগের পরে প্রকাশ্য সমাজ-জীবনে নারীর কোনো ভূমিকা আর রইল না। [ব্রীস্টপূর্ব ৩২৭ সালেও মেসেগা অবরোধকালে ভারতীয় নারী যোদ্ধার কথা কার্টিয়াস উল্লেখ করেছেন কিন্তু ততদিনে এ ভূমিকা ব্যতিক্রম, আপদকর্মে পর্যবসিত] ব্রাহ্মণের যুগেই নারীকে অবরোধে রাখার কথা শুনি, “নইলে তার শক্তিকর্য হবে!” [শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪/১/১৩১] এ কেন শক্তি যা শুধু অবরোধে থাকলেই অক্ষুণ্ণ থাকে? অথর্ববেদে অনেকগুলি “প্রতিষ্ঠাপন” সূক্ত আছে, এগুলি পলাতকা বা পলারনে উদ্যতা স্ত্রীকে অস্তঃপুরে ধরে রাখবার জন্য প্রয়োগ করা হত। কাজেই অস্তঃপুরবাসিনী ক্রমেই বন্দি হয়ে উঠছিল।

গোষ্ঠীবদ্ধ, কৌমবদ্ধ সমাজ ভেঙে পরিবার-আশ্রিত বা ‘কুল’-বদ্ধ সমাজ প্রবর্তিত হচ্ছিল ধীরে ধীরে। একটি বৃহৎ পরিবারের বাসগৃহের নাম ‘কুল’, এখানে তিনচার পুরুষের সংসার। এ সংসারের ছোট ছোট বিভাগে একটি পুরুষকে ঘিরে তার নিজস্ব যে পরিবার সেখানে স্বামীই সর্বময় কর্তা। এবং ঐ বৃহৎ যৌথ পরিবারের পরিবেশের মধ্যেই, গুরুজন এবং ছেলেমেয়েদের সামনেই, সে পুরুষ বহু নারীকে একে একে নিয়ে আসছে পত্নীরূপে। এই স্বাধীনতা কিন্তু তার স্ত্রীর নেই, কারণ “এক স্বামীর বহু স্ত্রী থাকলেও একটি স্বামীই তাদের পক্ষে যথেষ্ট” [ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩/৫/৩/৪৭] তেমনিই খোরালখুশিমত পুরুষ গণিকালয়ে যেতে পারত, তার উপপত্নী ও গণিকাসম্মোহে সমাজ কোনো বাধা দেয়নি; কিন্তু স্বামীর হাজার দোষ থাকলেও নারী উপপত্তি গ্রহণ করলে সমাজে সেটা মহাপাতক বলে গণ্য করা হত। আর গণিকালয়ের মত কোনো বিকল্প ব্যবস্থা তো নারীর জন্য কখনোই কোথাও ছিল না।

বিবাহকালে বর বলে, “এস আমরা মিলিত হই, যেন পুত্রসন্তান উৎপন্ন হয়, যে সন্তান

দ্বারা সম্পত্তিবৃদ্ধি হবে”। এরই শেষাংশে প্রার্থনা আছে, পুত্র, পৌত্র, দাস, শিষ্য, বস্ত্র, কন্দল, ধাতু, বহু ভাষা, রাজা, অন্ন ও নিরপত্তার জন্য। [হিরণ্যকেশী গৃহসূত্র ১/৬/১২/১৪] লক্ষ করতে হবে যে প্রথমত, বিবাহের সময়েই, নব-বিবাহিত বধূর সঙ্গে এবং তার সামনেই ‘বহু ভাষা’র জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে এবং দ্বিতীয়ত, কতকগুলি ভোগ্য বস্তুর সঙ্গে বহু ভাষার উল্লেখ। ব্যতিক্রম, পুত্র-পৌত্র, শিষ্য ও রাজা; এর মধ্যে পুত্রপৌত্র নির্জের ব্যক্তিসত্তারই সম্প্রসারণ— কালে, অর্থাৎ মৃত্যুর পরও বংশধারার যাতে বিলোপ নাহয়; শিষ্য জীবিকার পক্ষে অত্যাবশ্যক, আর রাজা নিরপত্তার পক্ষে। নইলে বস্ত্র, কন্দল, ধাতু, দাস ও ‘বহু ভাষা’ সবই ভোগ্য বস্তু। কন্যা সম্প্রদানের সময়ে মাতামহ পিতামহের উল্লেখ আছে, মাতামহী পিতামহীর নাম নেই, অথচ পিতামাতা পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন এঁদের অবলম্বন করেই। বিবাহে কন্যা সম্বন্ধে পুরুষের পাঁচটি কাম্যবস্তু, ধন, রূপ, বিদ্যা, বুদ্ধি ও বংশ, এর মধ্যে বিদ্যা ও বুদ্ধির সত্তা কোনো উপযোগিতা আছে কিনা তা নিয়ে বিস্তার তর্ক আছে। [মানবগৃহসূত্র ১/৭৬; অন্যত্রও আছে]

স্ত্রীর প্রধান প্রয়োজন হল সে সন্তানের জননী এবং তার প্রধান কর্তব্য হল, পুত্রসন্তানের জন্ম দেওয়া। [আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১/১০-৫১-৫৩] নিঃসন্তান বধূকে বিবাহের দশ বছর পরে ত্যাগ করা যায়। যে স্ত্রী শুধু কন্যাসন্তানের জন্ম দেয় তাকে বারো বছর পরে, মৃতবৎসাকে পনের বছর পরে এবং কলহপরায়ণাকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করা যায়। [বৌধায়ন ধর্মসূত্র ২/৪/৬; অপস্তম্ব ধর্মসূত্র ২/৫/১১-১৪, মনুসংহিতা ৯/৪ a] ও পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে না পারলে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার বিধান বহু প্রাচীন; শতপথ ব্রাহ্মণেই পড়ি, “যা বা অপুত্রা পত্নী সা পরিবৃত্তী” [৫/২/৩/১৩] যে অপুত্রা পত্নী সে পরিত্যক্তা; এবং পুত্রসন্তান না জন্মালে স্বামী আবার বিয়ে করতে পারবে। [বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র ২৮/২-৩] অপরপক্ষে মানবিকতার বোমে অনুপ্রাণিত শাস্ত্রবাক্যও আছে, যেমন ‘কলহপ্রিয়া, অশুচি, গৃহত্যাগিনী, বলাৎকৃতা, চৌরগৃহীতা হলেও স্ত্রী ত্যাগ করা চলে না; দুষ্টা স্ত্রীও প্রায়শ্চিত্তে শুচি হয়। [বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র ২১/৮-১০] আপস্তম্ব বলেন স্ত্রীপরিভ্যাগী স্বামীর কাঠোর দণ্ডবিধান করা উচিত। [আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১/১০-১৯, ২৮] স্ত্রীকে কটুকথা বললেও ৭-৮ দিন উপবাসের প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে। [বৌধায়ন ধর্মসূত্র ২/২/৬৩, ৬৪] কিন্তু সমাজ এ বিষয়ে কি ভাবত তার জন্য উদাহরণই দেখা যেতে পারে। কোনো কোনো গর্ভশাস্ত্রে আছে বলাৎকৃতা নারীকে পরের মাস থেকে স্বামী শুচি জ্ঞান করবেন; বশিষ্ঠ ৭-৮ দিন বলাৎকৃতা নারী প্রায়শ্চিত্তে শুচি হন। আপস্তম্ব বলছেন স্ত্রীকে কটুকথা বললেও ৭-৮ দিন উপবাস করতে হবে প্রায়শ্চিত্তের জন্য। অবশ্য স্বামীকে কটুকথা বললে তৎক্ষণাৎ ৭-৮ দিন উপবাস হতেন স্ত্রী। সে যাই হোক, রামচন্দ্র তো নিশ্চয়ই এসব জানতেন, বিশেষত

যখন শাস্ত্রকাররা তাঁকে আদর্শ চরিত্র মানতেন, সেই রামচন্দ্র যদি সত্যি বিশ্বাসও করে থাকেন শাস্ত্রানুসারে একমাস পরে তাঁকে শুচিজন সম্পাদন করতে পারতেন, এবং নিজে যেসব অন্যান্য কথা বলেছিলেন তার জন্য তাঁর উপবাস করা উচিত ছিল, দণ্ডও তাঁর পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এসবের কিছুই তিনি করেননি বা প্রায়শ্চিত্তও হয়নি তাঁর, আদর্শচরিত্র হয়েও, কাজেই, অর্থাৎ এসব মানবিক নির্দেশ ছিল শুধু শাস্ত্রকারদের লেখার জন্য, কার্যক্ষেত্রে পুরুষশাসিত সমাজে ওসব বইয়ের পাতাতেই এই ধরনের গুণতে ভাল বিধান আরও আছে, “ধর্মিতা নারীকে ধর্মণকারী বিবাহ করলে বিধিমাতে বিনা পণেই তার বিয়ে হতে পারে।” [বৌদ্যন ৪/১/১৫-১৬] কিন্তু সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যে ঐষ্টা স্ত্রী দণ্ডবিধান ছাড়া কিছুই পায়নি সমাজের কাছে। তেমনি একাধিক ধর্মশাস্ত্রকার বলছেন ঐষ্টা স্ত্রীকে স্বামী পরিত্যাগ করলে [তাহলে ঐসব উদার শাস্ত্রবাক্য সত্ত্বেও স্বামী তাকে পরিত্যাগ করত] ও পুত্র তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে। স্পষ্টই বোঝা যায়, তথাকথিত যৌন দুর্নীতি সম্বন্ধে সমাজে পরিষ্কার দুধরনের বিধান ছিল, একটি পুরুষের জন্য একটি নারীর জন্য। নারীর ক্ষেত্রেই যৌন অপরাধ অপরাধ, পুরুষের ক্ষেত্রে সমাজ অনেক প্রশয়শীল ছিল। যেদেশে ‘সতী’ বা ‘সাম্বী’ শব্দের ঐ অর্থে কোনো পুংলিঙ্গ প্রতিশব্দই নেই, সেদেশের সমাজে অন্যরকম কিছু আশা করাও যায় না।

“কুমারী কন্যার পিতা যথাকালে বিবাহ দিতে না পারলে সে তিনবছর (বা তিনমাস) পরে যাকে ইচ্ছে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু বিয়ে তাকে কোনোরকম অধিকার দেবে না, সব অবস্থাতেই সে পুরুষের অধীন।” বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রে পড়ি, “পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে। রক্ষতি হবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমহতি।” [৫/১-২, ২/২, ৩, ৪৪, ৪৫] অর্থাৎ নারীকে কৈশোরে রক্ষা করবেন পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ষিকে পুত্ররা; নারী স্বাধীনতার যোগ্য নয়। কত আগে শতপথ ব্রাহ্মণে দেখি, “স্ত্রিয়ঃ পুংসোহনুবৎসানো ভাবুকাঃ” অর্থাৎ নারীর পুরুষের অনুগামিনী হওয়া উচিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে পড়ি, “পতিং বা অনু জায়”, [১/৯/২/১৪] অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীর পশ্চাতে। মনে পড়ে যায়, ঋগ্বেদে উষার বর্ণনা, “উষো যাত্তি স্বসরস্য পত্নী [১/১১৫/২] সূর্যের পত্নী উষা চলেছে; কোথায়? সূর্যের বা স্বামীর আগে আগে। তারপরে নদীতে অনেক জল বয়ে গেছে, তখন ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের যুগে স্ত্রী স্বামীর অনুগামিনী, অধীন। একদিকে বলা হচ্ছে, “স্ত্রিয়া বা এতজুপং যং পত্ন্যঃ [তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩/৯/৪/১৯] অর্থাৎ পত্নীই হল সমুদ্রের রূপ; অন্যদিকে শুনি “তদৈ সমুদ্রং যস্য কনীয়াংসো ভাব্য আসন্ ভূয়াংসঃ পশবঃ” [শতপথ ব্রাহ্মণ ২/৩/২/৮];

তারই হল সমুদ্র, যার পশুপালের চেয়ে স্ত্রীরা সংখ্যায় কম। এক তো পশুপালের সঙ্গে একনিঃশ্বাসে উচ্চারিত হল স্ত্রী; দ্বিতীয়ত, কত সংখ্যায় স্ত্রী থাকার সম্ভাবনা থাকলে সে সংখ্যা পশুপালের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে।

নারীকে যথেষ্ট শাসন ও ভোগ করবার অধিকার পুরুষকে দিয়েছে শাস্ত্র, কিন্তু তার জন্য দায়িত্ব যা দিয়েছে তা নেহাৎই নগণ্য। বৌদ্যন ধর্মসূত্রে অবশ্য পড়ি, “সর্বেষাং বর্ণানাং বধু রক্ষ্যতমা ধনাং” অর্থাৎ সমস্ত বর্ণেরই উচিত ধনের চেয়ে স্ত্রীকে রক্ষা করা, [২/৪২] কিন্তু কার্যত যে নীতি অনুসৃত হত তা হল চাণক্যের সেই চূড়ান্ত সুবিধাবাদী নীতিটি। “আত্মানং সততং রক্ষেন্দারৈরপি ধনৈরপি।” নিজেকে সর্বদাই রক্ষা করবে, প্রয়োজন হলে ধন বা স্ত্রীর বিনিময়েও। বৈদিক বা পরবর্তী সাহিত্যে ধনের বিনিময়ে স্ত্রীকে রক্ষা করার কোনো নজিরই মেলে না। বৈদিক যুগের একেবারে প্রথম পর্বের পরে শিক্ষাতেও নারীর অধিকার নেই তার কারণ দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া উপনয়নে তার অধিকার নেই। জন্মাবধি তার সম্বন্ধে সমস্ত সংস্কারই অমল্লক; সে নিজে মন্ত্র উচ্চারণে বা হব্যদানে অনধিকারিণী; এবং সে যুগে বিদ্যা তো মন্ত্র দিয়েই হত, কাজেই বিদ্যা অর্জনে তার আর অধিকার রইল না। অমল্লক বিদ্যা অর্থাৎ সামান্য কিছু গানবাজনা, সোলাইবোনা, হাতের কাজ আর যাবতীয় গৃহকর্ম, স্বামী সন্তান ও শ্বশুরবুলের উদয়াস্ত সেবাই ছিল তার কাজ। সন্তানের, মুখ্যত পুরুষসন্তানের, জননী হওয়াতেই তার চূড়ান্ত চরিতার্থতা। অথচ অন্য সব দেশের মত এখানেও কিছু পুরুষের শিক্ষিতা নারীর সান্নিধ্য পাবার স্বাভাবিক সুহু আকাঙ্ক্ষা ছিল। সে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হতে পারত একমাত্র গণিকালয়ে; কারণ একমাত্র গণিকাই ছিল শিক্ষিতা; এবং একমাত্র সে-ই স্বাধীন নারী ছিল প্রাচীন ভারতে। কুলবধূকে শিক্ষা থেকে সর্বতোভাবে বঞ্চিত করে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে, গণিকাকে সর্ববিদ্যায় পারদর্শিনী করে সমাজ কুলনারীর প্রতি চূড়ান্ত অপমানের ব্যবস্থা করেছিল। সন্তানধারণে এবং জালনে, গৃহকর্মে এবং পরিচর্যায় হতস্ত্রী ও বিগতযৌবনা অশিক্ষিতা স্ত্রী যখন স্বামীর মনোরঞ্জে অক্ষম, তখন স্বাধীনযৌবনা শিক্ষিত গণিকার দিকে ঝিড়কির দরজা খুলে রেখে সমাজ কুলনারীকে অসম্মানের পাত্রী করে তুলতে দ্বিধা করেনি।

সোমযাগের একটি প্রকরণ হল অগ্নি পত্নীবৎ। সেখানে আছে, “বজ্র বা লাঠি দিয়ে নারীকে মেয়ে দুর্বল করা উচিত, যাতে নিজের দেহ বা সম্পত্তির ওপরে তার কোনো অধিকার না থাকে।” [শতপথ ব্রাহ্মণ ৪/৪/২/১৩] এখানে যজ্ঞের প্রসঙ্গে একটা অনুষ্ঠানে যজ্ঞীয় হবি-কে কেন লাঠি দিয়ে মারতে হবে তারই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ কথা এসেছে; কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় ঐ ব্যাখ্যার ছলে স্ত্রীকে লাঠি দিয়ে মারবার অবাধ অধিকার পুরুষকে দিয়েছে শাস্ত্র। আর দিচ্ছে সমস্ত সম্পত্তি থেকে তাকে বঞ্চিত করবার

অধিকার; এবং তার চেয়েও বড় কথা, তার নিজের দেহের ওপরেও তার কোনো অধিকার যেন না থাকে সে ব্যবস্থাও পাকা করেছে। প্রচলিত সামাজিক আচরণেরই শাস্ত্রীয় সমর্থন মেলে এতে। সবচেয়ে বিখ্যাত এবং দীর্ঘ যে বৃহদারণ্যক উপনিষদ, তাতে স্বয়ং ঋষি যজ্ঞবল্ক্য বলছেন; “স্ত্রী স্বামীর সন্তোগকামনা চরিতার্থ করতে অসম্মত হলে প্রথমে উপহার দিয়ে স্বামী তাকে ‘কেনবার’ চেষ্টা করবে (যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হল ‘অবিরজিণীয়াৎ, যেন স্ত্রী পণ্যদ্রব্য), তাতেও অসম্মত হলে হাত দিয়ে বা লাঠি দিয়ে মেরে তাকে নিজের বশে আনবে”। [৬/৪/৭] কাজেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নারীর মন বলে কিছু আছে, একথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে, তার দেহে তার কোনো অধিকার নেই এবং তাকে অসম্মান শুধু নয়, মারধোর করারও পূর্ণ অধিকার স্বামীকে দেওয়া হল, যে-স্বামী বহু পত্নীকে ইচ্ছামত আনলে, জারিণী বা উপপত্নী সান্নিধ্যে গেলে এমনকি গণিকালয়ে গেলেও স্ত্রী কোনভাবে উচ্চাচ্য করতে পারবেন না। করলেই তাকে ত্যাগ করবার অধিকার আছে স্বামীর। মনে রাখতে হবে এ ত্যাগের কি অর্থ ছিল সে সমাজে — গণিকাবৃত্তি বা দাসীবৃত্তি ছাড়া কোনো গতি ছিল না পরিত্যক্তা নারীর। তার নিজের সম্পত্তি থাকত না এবং পিতা বা স্বামীর ধনে তার কোনো অধিকারও স্বীকৃত ছিল না। [মৈত্রায়ণী সংহিতা ১/১০/১১; ৩/৬/৩; তৈত্তিরীয় সংহিতা ৪/৫/৮/৭] এবং জীবনধারণের উপযোগী কোনো বৃত্তির শিক্ষা তাকে দেওয়া হত না। ফলে শুধু বেঁচে থাকার জন্যই তাকে সর্বত্রভাবে স্বামীর অধীনে থাকতে হত।

বারবার বলা হয়েছে যে নারীর সভায় যাবার অধিকার নেই [মৈত্রায়ণী সংহিতা ৪/৭/৪]; কোনো শিক্ষা পাবার, ধন অর্জন বা স্বাধীনভাবে ভোগ করবার, এমনকি নিজের দেহটিকেও অবাঞ্ছিত সন্তোগ থেকে রক্ষা করবারও অধিকার তার নেই। [মৈত্রায়ণী সংহিতা ৩/৬/৩; ৪/৬/৭; ৪/৭/৪; ১০/১০/১১; তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬/৫/৮/২] তার ছেলেমেয়েদের সামনেই তার স্বামী একাধিক পত্নী, উপপত্নী এনে অথবা গণিকাগমন করে তাকে অসম্মান করলে নিষ্প্রতিবাদে তাকে তা সহ্য করতে হবে, অথচ তা সামান্যতম পদস্থলনে সমাজ কঠোরভাবে দণ্ড দেবে। আপস্তম্ব [ধর্মসূত্র ২৩/৪] হিরণ্যকেশী [গৃহসূত্র ১/৪/১৪/২] ব্যতিচারিণী নারীর যে দণ্ডের বিধান দিয়েছেন তা যেমন নিষ্ঠুর তেমনি ঘৃণ্য; উচ্চারণ করতেও জুড়ঙ্গা বোধ হয়। স্ত্রীর প্রেমিককে হত্যা করবার জন্য স্বামীর অভিচারত্রিয়ার বিধান ও নির্দেশ দেওয়া আছে শান্ত্রে। [বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪/৪/১২, ১৩; হিরণ্যকেশী গৃহসূত্র ১/৪/১৪/৭] অথচ অনুরূপ ক্ষেত্রে পুরুষের কোনো দণ্ড নেই। সে তার বহু পত্নী, উপপত্নী এবং যথেষ্ট গণিকালয় গমনের অবাধ অধিকার সমস্তে রক্ষা করেছিল। ‘প্রজাপাত্য’ নামে লঘু একদিনের নামমাত্র প্রায়শ্চিত্তের বিধান

আছে বটে কোথাও কোথাও, কিন্তু সুবৃহৎ সংস্কৃত সাহিত্যে কোনো গণিকাগামী কখনো কোনো প্রায়শ্চিত্ত করেনি।

তাহলে বৈদিক ভারত কী চোখে দেখেছিল নারীকে? নারী অশুচি, স্বভাবত পাপিষ্ঠা ও অমঙ্গলের হেতু। চাতুর্মাস্যের অন্তর্গত বরুণপ্রঘস যজ্ঞে প্রকাশ্য জনবহুল যজ্ঞসভায় প্রতি প্রস্থাত্তা পুরোহিত যজমানপত্নীকে (যজমানকে নয় কিন্তু) প্রণম করতেন, “কেন সহ চরসি” [তৈত্তিরীয় সংহিতা ২/৫/২/২০], অর্থাৎ কার সঙ্গে ব্যতিচারিণী হয়েছে? এ প্রকাশ্য অপমান সহ্য করে তাকে উত্তর দিতে হত; নইলে যজ্ঞ নষ্ট হবে যে! মৈত্রায়ণী সংহিতা উচ্চারণ করেই বলেছে, ‘নারী অশুভ’। [৩/৮/৩, তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও একই কথা ৬/৫/৮/২] বলা হয়েছে, যজ্ঞকালে কুকুর, শূদ্র ও নারীর দিকে তাকাতে না [শতপথ ব্রাহ্মণ ৩/২/৪/৬] এসব উক্তি এমনই স্পষ্ট যে অধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার কোনো অবকাশই নেই।

নারীর সর্বপ্রধান সংজ্ঞা দুটি, তার স্থানও ঐ দুটিতেই সীমাবদ্ধ; সে পুত্রের জননী এবং সে ভোগ্যবস্তু। তৈত্তিরীয় সংহিতাতেই শুনি, “তস্মাদু হ স্ত্রিয়ো ভোগ্যমেব হরয়ন্তে”, অতএব নারী সন্তোগ আনে। [২/৩/১০/৭] এটির রচনাকাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতক, তার মানে প্রায় তিন হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষ নারীকে ভোগ্যবস্তু-রূপে দেখেছে। পরবর্তীকালের গৌতম ধর্মসূত্রে পড়ি, “পশুভূমিঞ্জীণামণতিভোগঃ”, [১২/৩৯] পশু, ভূমি ও নারীর অধিক ভোগ নয়। নারীর ভোগ্যরূপ বারবার উল্লেখ করেছেন শাস্ত্রকাররা অকুষ্ঠভাবে, নির্লজ্জভাবে। তাই নারী দক্ষিণার তালিকার স্থান পায়। ‘স্বরস্বতানাময়ন’ যাগের দক্ষিণা হল একটি ঘোটকী এবং একটি সন্তানবতী দাসী। [শাখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র ১২/২৯/২১] ঘোড়া ব্যবহারে লাগবে, দাসীর পুত্র বড় হয়ে ভৃত্য হবে, দাসী স্বয়ং ভোগ্যবস্তু হবে অর্থাৎ দক্ষিণাবাদ বিনামূল্যে একটি ঘোড়া একটি ভোগ্যানারী, দাসী ও একটি ক্রীতদাস পাওয়া গেল। পেলেন কে? যজ্ঞের ব্রাহ্মণ পুরোহিত। অন্যান্য বহু যজ্ঞে নানা স্তরের নারী দক্ষিণা— সন্তানবতী, অগ্রসূতা ও অনুসূতা শ’য়ে শ’য়ে, হাজারে হাজারে। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীগুলি বৈদিক যুগের অল্প পরের সমাজেরই চিত্র বহন করে; সেখানে ও পরবর্তী পুরাণগুলিতে অসংখ্যবার পড়ি অতিথিসৎকারে, উৎসবে, যুদ্ধে, যজ্ঞে, যৌতুকে, দানে ও দক্ষিণায় গাভী-স্বর্ণ-শস্য-রথ-গজ-অশ্বের সঙ্গেই অগণিত নারী দান করা হচ্ছে। এমন দান সম্ভবই হত না যদি নারীকে বস্তু এবং মুখ্যত ভোগ্যবস্তু বলে না দেখা হত। নারী সম্পত্তি, তাই নারীকে জুয়াখেলায় পণ রাখা যাচ্ছে। সেই ঋগ্বেদের সময় থেকে [অক্ষসূক্ত ১০/৩৪/৪] মহাভারত পর্যন্ত।

“কন্যা অভিষাপ” [ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬/৩/৭/১৩] তাই সন্তানসম্ভবা নারীর একটি আবশ্যিক অনুষ্ঠান হল ‘পুংসবন’, যার উদ্দেশ্য হল যাতে গর্ভস্থ সন্তানটি পুরুষ হয়। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে পড়ি, “(নারীং) ন হৃদয়েন প্রার্থয়েৎ” [১/২৭৭/১-১০] অর্থাৎ হৃদয় দিয়ে নারীকে প্রার্থনা করা উচিত নয়; কিন্তু যথেষ্ট ভোগ করার কোনো বাধা নেই। “নারী মিথ্যাকারিণী, দুর্ভাগ্যবরপিণী, সূরা বা দূতকীড়ার মত একটি ব্যসনমাত্র।” [মৈত্রায়ণী সংহিতা ১/১০/১১; ৩/৬/৩] খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতকের কাছাকাছি রচনা-এই সংহিতা; এবং অত আগেই নারী ব্যসনে পর্যবসিত হয়ে গেছে। “নারী রাত্রি স্বামীকে মুগ্ধ করে নিজের ইষ্টসন্ধি করে নেয়” [কার্কক সংহিতা ৩১/১; ঐ সময়েরই রচনা] অর্থাৎ নারী ছলনাময়ী, স্বার্থপর; বেন পুরুষ উৎকৃষ্টতর জীব, এসব দোষ তার নেই; একা নারীরই আছে। “সর্বগুণাযিতা শ্রেষ্ঠ নারীও তাই অধমতম পুরুষের থেকে হীন।” [তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬/৫/৮/২] অন্ত অর্থাৎ মিথ্যা কি? “স্ত্রী, শূদ্র, কুকুর, কালো পাখি; এদের দেখো না; নইলে শ্রী ও পাপ, জ্যোতি ও অন্ধকার, সত্য ও মিথ্যা মিশে যাবে।” [শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪/১/১/৩১] স্ত্রী স্বামীর পরে যাবে [ঐ] কারণ “ভুক্তোচ্ছিষ্টংবৎশ্চৈব দদাৎ”, [খাদির গৃহসূত্র ১/৪/১১] খেয়ে এঁটেটা স্ত্রীকে দেবে। এর চেয়ে স্পষ্ট করে নারীর স্থান নির্ণয় করা কঠিন, যেখানে দাস সম্বন্ধে বলা হয়েছে জীব জন্তো কাপড় দাসকে দেবে এবং স্ত্রী সম্বন্ধে বলা হয়েছে খেয়ে এঁটেটা স্ত্রীকে খেতে দেবে, সেখানে স্ত্রীকে কোন্ পর্যায়ে দেখা হয়েছে, সে সম্বন্ধে কোনো সংশয়েরও অবকাশ আর রইল না। একথা সবচেয়ে স্পষ্ট করে বলা আছে আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে :

“কালো পাখি, শকুনি, নেউল, ছঁচো ও কুকুর হত্যা করলে যে প্রায়শ্চিত্ত, নারীহত্যা ও শূদ্রহত্যাতেও সেই একই প্রায়শ্চিত্ত” অর্থাৎ মাত্র একদিন কচ্ছসাধন। [১/৯/২৩, ৪৫]

পরবর্তী সাহিত্য যে নারীকে ভোগ্যবস্তু ও পণ্যদ্রব্য বলতে সাহস করেছে তার জোরটা জুগিয়েছে বৈদিক সাহিত্যই। ক্রমেই অবশ্য ঐ ভোগ্যদ্রব্য ও পণ্যদ্রব্যই জোর দেওয়া বেড়েছে। রামচন্দ্র সীতাকে প্রত্যাখ্যান করবার সময়েও বলেছেন পরহস্তগতা নারীকে তিনি “ভোগ” করতে পারবেন না; এই হল প্রাচীন ভারতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মূল কথা। ক্রমেই অপরাধের দুর্ভেদ্য অন্তরালে নারীকে সরে যেতে হয়েছে। কেন এমন হল? কেন ধীরে ধীরে নারীর ব্যক্তিগত সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে সে বস্তুতে পরিণত হল? এর বিস্তৃত বিশ্লেষণ এখানে করব না, শুধু একটা দিকের কথাই বলব। সম্পত্তিতে গোষ্ঠীগত স্বত্বাধিকার থেকে যখন ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল অর্থাৎ গোষ্ঠী ও কৌম ভেঙ্গে ‘কুল’ বা যৌথ পরিবারই সমাজের ন্যূনতম সংগঠন হল ততদিনে আরও একটা ব্যাপার ঘটেছে

সমাজে। উৎপাদনে কিছু উদ্বৃত্ত ধনের সৃষ্টি হয়েছে এবং সে উদ্বৃত্ত ধন মুঠমেয় কিছু লোকের মধ্যে বিভক্ত হচ্ছে। এই ধন, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আক্ষরিক অর্থে হোপার্জিত নয়, নিচের দিকের মানুষের শ্রমশক্তিকে ব্যবহার করে, শোষণ করে যা পাওয়া গেছে, তা যেহেতু কোনো ব্যক্তিগত গুণ বা যোগ্যতার দ্বারা লব্ধ নয়, তাই সে সম্বন্ধে ধনাধিকারীর যেন একটি অতিরিক্ত স্বত্বাধিকারবোধ জন্মায় এবং তারই সঙ্গে একটা আতঙ্ক আসে, পাছে সেটা তার নিজের এবং নিজের সন্তান বা বংশধারার দখলের বাইরে চলে যায়। ব্যক্তির পরমাদুর তো সীমা আছে, তারপরে? তারপরেও যাতে সে ধন তারই বংশধররা ভোগ করতে পারে সে সম্বন্ধে ভীষণ একটা আকাঙ্ক্ষা ও উদ্বেগ জন্মায়। এ ধন কার হাতে দিয়ে যাওয়া যায়, নিশ্চিতভাবে নিজেরই সন্ততি ছাড়া? কেমন করে নিশ্চিত হওয়া যায় সন্তানটি ঠিক তারই কিনা? স্ত্রীকে চোখে চোখে রেখে। যথাসম্ভব পর পুরুষের সম্পর্ক থেকে দূরে রেখে। এই কারণেই নারীর বহুপতিত্ব সমাজে নিষিদ্ধ হয়ে গেল কারণ তাতে সন্তানের পিতৃপরিচয় সংশ্লিষ্ট থেকে যায়। ভুলে গেলে চলবে না, এ যুগের পূর্বযুগে যখন সমাজ গোষ্ঠী ও কৌমবদ্ধ ছিল তখন সকল সন্তানই কৌম বা গোষ্ঠীর সন্তান বলে পরিচিত ছিল; তখন পিতৃত্ব বা পতিত্বের সীমা এমন সুস্পষ্ট মেটা দাগে আঁক ছিল না। এ ব্যাপারটা তখনও জীবিত স্মৃতির মধ্যেই ছিল, তাই আরও আতঙ্ক। গোষ্ঠীযুগে সব নারীই গোষ্ঠীর বা কৌমের সব পুরুষের ভোগ্য ছিল, সব পুরুষও সব নারীর। নারীর ধরনের স্বাধীনতার যুগে স্ত্রীর বা সন্তানের পরিচয় একটি পুরুষের সঙ্গে এমন একান্ত ও অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল না। সে যুগ সদ্য পেরিয়ে এসে ব্যক্তিগত মালিকানার দিনে সম্পত্তি যখন একান্ত ও নিশ্চিতভাবে নিজেরই সন্তানের জন্য রেখে যাবার উগ্র বাসনা জাগল, তখন যাতে ঔরসজাত সন্তানটিকে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করতে পারা যায় তাই স্ত্রীকে অন্য সব পুরুষ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখার এমন প্রয়োজন বোধ হল। তাছাড়া স্ত্রীও তো তখন সম্পত্তি, অতএব সে যাতে অন্যের ভোগ্য না হয়, তার ওপরে ব্যক্তিগত মালিকানা তাই বোলআনা জাহির করা চাই। আরও একটা কারণ ছিল; পুরুষের যথেষ্ট পরনারী সন্তোগের অধিকার তখন সমাজ মেনে নিয়েছে; সে তখন বৈধ বিবাহে — অনুলোম ও প্রতিলোমে — বহু পত্নীর স্বামী, আরও বহু উপপত্নীর উপপতি, এবং এ ছাড়াও তার খিড়কির দুরার খোলা গণিকালয়ের দিকে। এই জীবনে অভ্যস্ত পুরুষ স্বভাবতই তার একান্ত ভোগ্য পত্নীটিকেও সেইরকম সন্দেহের দৃষ্টিতেই দেখবে, কারণ ‘আত্মবন্দন্যতে জগৎ’। তাই তার স্ত্রীর সম্বন্ধে তার পাহারা বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে গেল যখন নারী হল কয়েদি এবং স্বামী তার প্রহরী। এই হল উত্তর বৈদিক যুগের সমাজচিত্র। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সে ব্যতিক্রমই। পরবর্তী দুটি সহস্রাব্দে শেকলগুলো দূতর হয়ে

নারীকে পাকে পাকে ফেরে ফেরে বেঁধেছে, জোর তাল্লা আরও মজবুত হয়েছে। এর মধ্যে কখন যে গ্রহরী নিজেই বন্দী হয়েছে তার বৈরাচারজনিত সংশয়ের জ্বলন্ত বন্ধনে, কখন যে সে তার বন্ধু ও সহচারিণীকে হারিয়ে ফেলে তার বদলে পেয়েছে নিরক্ষর নিপ্পাণ এক যন্ত্রতুল্য দাসীকে, তা সে নিজেই জানে না। নিরঙ্কুশ শাসন ও শোষণ মানুষ কখনো চিরদিন মাসে না। যে-বঞ্চনা করতে পুরুষ এত আটঘাট বেঁধেছিল সে বঞ্চনা শেষ পর্যন্ত তাকেও বঞ্চিত করেছে। আর, যে পরিমাণে নারী সে বঞ্চনাকে নিজের মধ্যে নিপ্পতিবাদে মেনে নিয়েছে সে পরিমাণে সেও তার স্বরচিত শৃঙ্খলে বন্দিনী। বৈদিক ভারতবর্ষে নারীর মর্যাদা ছিল না, মানুষ বলে তার কোনো স্বীকৃতিই ছিল না। অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতাতেও ছিল না, তবে তাদের উত্তরপুরুষরা এখন স্বীকার করে সে কথা; বলে নারী এই শতাব্দীতেই প্রথম অধিকারসচেতন হয়েছে, আগে সে অত্যাচারিতা বন্দিনীই ছিল। শুধু আমরাই বলবার চেষ্টা করি যে বৈদিক যুগে নারী স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। এতে শুধু যে সত্যের অপলাপ হয় তা নয়, অতীতকে যথার্থভাবে না দেখতে পাওয়ার জন্যে অতীতের যে বিধ বর্তমান সমাজদেহে সঞ্চারিত, তাকে চিনতে, তার প্রতিবেদন করতে এবং সুস্থ এক ভবিষ্যতের প্রস্তুতি-বিধান করতে অনাবশ্যক দেয় হয়ে যায়।



জাতপাত বিলুপ্তির জন্য কিছু দায়িত্ব সম্পর্কে

অনুরাধা গান্ধী

ভাবান্তর - দুলাল কৃষ্ণ বিশ্বাস

সর্বহারার দলের জাতব্যবহার বিরুদ্ধে কর্মসূচির প্রেক্ষাপটটি এরূপ যে জাতপাতের বিরুদ্ধে সংগ্রামের লক্ষ্য হবে সামন্ততন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের উচ্ছেদসাধন, এরাই ভারতে জাতব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখছে। অতএব —

১. নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করার সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সর্বহারাকে অবশ্যই তার শ্রেণি সংগ্রামকে জাতপাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরিচালিত করতে হবে।
২. এই লক্ষ্যার্জনের জন্য সমস্ত শোষিত শ্রেণিকে জাতপাত ভিত্তিক নিপীড়ন, শোষণ এবং পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে শ্রেণি সংগ্রামকে সংহত করুন।
৩. গ্রাম গ্রামে জাত-সংশ্লিষ্ট সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্বকে ভেঙে দিন এবং ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকের নেতৃত্বে থাকা নিপীড়িত শ্রেণি সমূহের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্পণ করুন।
৪. ভূমিহীন কৃষক ও দরিদ্র কৃষকের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে লাঙ্গল যার-জমি তার কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করতে সংগ্রাম করুন।
৫. ব্রাহ্মণতান্ত্রিক জাতপাত ভিত্তিক মতাদর্শের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য জাতপাত ভিত্তিক চিন্তা ভাবনার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করুন।
৬. ব্যক্তিগত বিশ্বাস অনুসরণ করার অধিকারকে সম্মান জানিয়েও সর্বপ্রকার জাতপাত সংস্কার ও উপবীত ধারণের মত আচারানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন মতাদর্শগত সংগ্রাম চালু রাখুন।
৭. পবিত্র ধারণা ভিত্তিক নিরামিষ ভোজনবাদ-এর বিরুদ্ধে এবং 'অপবিত্রতা' সম্পাদিত কুসংস্কারের অন্যান্য জাতপাতের আচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন।

৮. গোমাংস ভক্ষণ অথবা শূকরের মাংস ভক্ষণের মত কিছু রীতি এবং কিছু পেশার বিরুদ্ধে সামাজিক কলঙ্ক আরোপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করণ।
৯. জাত পরিচয়ের চিহ্ন এবং মর্যাদা স্থানিকর এবং জাত উল্লেখ করে অবমাননাসূচক ভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে লড়াই করণ।
১০. দলিত মানুষের আত্মমর্যাদার দাবির পক্ষে সংগ্রামে সক্রিয় সমর্থন জানান এবং পাশে দাঁড়ান। মন্দির প্রবেশে এবং ধর্মাস্ত্রিত হতে দলিতদের অধিকারকে রক্ষা করণ।
১১. দলিত ও অন্যান্য নিচুজাতের নাগরিক ও সামাজিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করণ এবং উপরদরদারের সাধারণের ব্যবহারে জলাশয়, হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও শৌচাগার প্রভৃতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিরোধিতা করণ।
১২. সামাজিক অনুষ্ঠানে নিম্নজাতের মানুষের সমানভাবে অংশগ্রহণের জন্য সংগ্রাম করণ। হোমিওপ্যাথি অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন জাতের মানুষের মধ্যে সামাজিক ভাব-বিনিময় স্থাপন করণ। বিভিন্নজাতের মানুষকে সহজেভাবে উৎসাহিত করণ।
১৩. জাত বিভাজনের ভিত্তিতে বাসগৃহ নির্মাণের বিরোধিতা করণ।
১৪. অসবর্ণ বিবাহের পক্ষাবলম্বন করণ এবং উৎসাহ যোগান। সব অসবর্ণ বিবাহের ক্ষেত্রে উৎসাহ জ্ঞাতা দাবি করণ। পিতা অথবা মাতার ক্ষেত্রে যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, অসবর্ণ বিবাহজাত সন্তানদের সেইসব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া উচিত।
১৫. প্রশাসনিক পঞ্জিতে জাতনাম ব্যবহার বন্ধ করণ।
১৬. সংরক্ষণের নীতি প্রয়োগ করার জন্য ট্রুড ইউনিয়নগুলিকে উদ্যোগ নিতে উৎসাহিত করণ। ব্যক্তিগতগতভাবে (ব্যক্তিগতগতভাবে) সংগ্রাম।
১৭. সংরক্ষণ চালু করার জন্য লড়াই করণ।
১৮. তপস্বীনাটক জাতের ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ জাতের মানুষদের জন্য ঋণ ও আর্থিক সহায়তা নিয়ে আত্মমূল্যবোধকে দীর্ঘসূত্রতা ও দুর্নীতির মোকাবিলা করণ।
১৯. প্রযুক্তি ও নিম্নজাতের এবং কারিগর জেলির মানুষের উন্নতির জন্য বিশেষ পরিকল্পনার দাবি জানান।

১৯. তপস্বীনাটক জাতের ও উপজাতির জন্য হোটেলের উন্নত সুযোগ-সুবিধার ও অত্রুতির পরিমাণ বৃদ্ধির দাবি করণ।
২০. জাতভিত্তিক সংগঠনের, বিশেষ করে উচ্চজাতের সংগঠনের, প্রতিদ্বন্দ্বিতাশীল বৈশিষ্ট্য উন্মোচন করণ।
২১. নিপীড়িত জাতের জাতপাতবাদী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করণ ও তাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করণ। এরা আনন্ডীনাটক জাতের এক গভীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। উচ্চজাতির জাতের দরিদ্রদের মধ্যে এমন এক আত্ম ধারণা আছে যে তারা তাদের স্বজাতির ধনীদের সাথে সামাজিকভাবে সমানধিকার ভোগ করেন। আমাদের এই মুহুর্তে উন্মোচন করতে হবে এবং তাদের বুঝতে হবে যে তাদের অসল সংগ্রামের সাথীরা আছেন অন্য জাতের নিপীড়িতদের মধ্যে। হোমিওপ্যাথি আমাদের কখনই জাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত নয়।
২২. নিপীড়িত জাতের নেতাদের সুবিধাবাদী ও সংস্কারবাদী প্রকৃতিতে উন্মোচন করণ এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করণ। নিপীড়িত জাতের মধ্যে বুজুর্জিয়া গণতান্ত্রিক মোহের বিরুদ্ধে লড়াই করণ।
২৩. সর্বদা এবং অমল্যবী অন্যান্য অংশের মধ্যে জাতগত সংস্কার এবং বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করণ এবং শোষিত হোমিওপ্যাথির মধ্যে সংগ্রামী একটি গড়ে তুলুন।
২৪. সবজাতের নিপীড়িতদের মধ্যে কমিউনিটদের এক হতে হবে এবং কথায় ও কাজে তাদের সাথে থাকতে হবে। একই সংগে আমাদের সেইসব নবঙ্গ কমিউনিটদের স্বরূপ উন্মোচন করতে হবে যারা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভাষা জাতপাতবাদী।
২৫. গণ সংগঠনের সক্রিয় কর্মীদের জাতপাত ভিত্তিক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করণ এবং নিজেদের শিক্ষিত করণ।
২৬. নীচ জাতের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধী কাজকর্ম এবং জাত বৈষম্যের মোকাবিলা করতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন মানুষদের নিয়ে বিশেষ মধ্য গঠন করণ।
২৭. যেসব এলাকায় জাতবৈরী উত্তেজনা বর্তমান সেখানে নিম্নজাতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দাঙ্গা-বিতোষী কোয়ালি গঠন করণ।

২৮. জড়বাদী বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচার করুন, নাস্তিকতা প্রসার ঘটান।
২৯. জাত ও লিঙ্গ নিরপেক্ষভাবে সকলের মধ্যে সাম্যের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সংগ্রাম করুন।

নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর জাতপাত

অনেকেই এমন ধারণা পোষণ করে যে একটা বিপ্লবের পর জাত-নিপীড়ন স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবলুপ্ত হবে। জাত বিষয়টিকে কেবলমাত্র উপরি কাঠামোতে দেখা হয়েছে এবং ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে যে একবার ভিত্তির পরিবর্তন ঘটলে উপরিকাঠামোর সমস্যা খুব একটা বাধা হয়ে উঠবে না।

বাস্তবে, এমন নয় যে ক্ষমতা দখলের পর কেবলমাত্র উপরিকাঠামোর স্তরে জাতপাত থেকে যাবে, তারও পূর্বে জাতপাতকে এক সমস্যা হিসেবে বুঝতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। যেখানেই এসব থাক, যদি জাতপাতের অবশেষ চলতেই থাকে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে।

অন্য বিষয়টি হলো এই যে, উপরিকাঠামোর সমস্যাটিকে ক্ষমতা দখলের পর পর্যন্ত স্থগিত রাখা যাবে না। এমনকি বিপ্লবের ঘটনাকালে যখন একে তার ভিত্তিমূলেই ফাংস করা হতে থাকবে তখনও যেখানেই বৈষম্য ও জাত সংস্কারের ঘটনা ঘটবে সেখানেই তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইতে হবে।



Anuradha Ghandy (1954-2008)

দক্ষিণভারত, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, জাতিভেদ ও স্বামী বিবেকানন্দ
আশীষ লাহিড়ী

১৮৮৬ সালে অক্ষয়কুমার দত্তের ও শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। একজন চরম যুক্তিবাদী, একজন পরম ভক্তিবাদী। অল্পত সমাপ্তন এই যে ঐ ১৮৮৬ সালেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একটি আত্মন রাখেন বাঙালি বিদ্বজ্জনের কাছে। তিনি একটি 'পরিবর্তনের সময়' (ট্রানজিশন পিরিয়ড) এর কথা বলেছিলেন, যার সূত্রপাত ১৮১৬ সালে, যখন থেকে রামমোহন রায় কলকাতায় বাস করতে থাকেন। শাস্ত্রী মশাইয়ের কথায়, 'পরিবর্তনের সময়, অনুবাদের সময়, শিক্ষার সময়, জিনিয়সের সময়, বড়ো বড়ো চিন্তাশীলগণের সময়। আমরা যাহা হইয়াছি ও হইতেছি তাঁহাদেরই কৃপায়, তাঁহাদেরই অধ্যবসায়ের গুণে, তাঁহাদেরই উচ্চকামনার ফলে। কিন্তু তাঁহারা যে পরিবর্তন সাধন করিয়া তুলিয়াছেন, এমন পরিবর্তন কি আর কখনো হইয়াছিল ...? যত ভাব তাঁহাদের সমবেত পরিশ্রমে বাংলায় ছড়িয়া পড়িয়াছে, এত কি আর কখনো কোনো দেশে কোনো কালে ছড়িয়া পড়িয়াছিল?' বিশেষ করে ১৮৬০-এর পর থেকে 'প্রাচ্য, পাশ্চাত্য সমস্ত বিদ্যা বাঙালির সম্মুখে আপনাদের গুপ্ত ভাণ্ডার প্রকাশ করিতেছে। আমরা এক-এক সময়ে এই অগাধ সাহিত্যরাশি চিন্তা করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া পড়ি।' এই অবিশ্বাস্য চিন্তা-সংঘাতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিহ্বল বাঙালি ভ্রমলোক শ্রেণী 'এমন সুবিধার কী কার্য করিতেছেন' তা বিচার করে দেখবার আহ্বান জানান তিনি: 'তাঁহারা নূতন সাহিত্য গঠনে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন, নূতন চিন্তাপ্রসার কতদূর চলিয়াছে, আর যাহা হইয়াছে তাহা হইতে কতদূর আশা করা যাইতে পারে।' 'কতদূর আশা করা যাইতে পারে', সে বিষয়ে শাস্ত্রী মশাইয়ের মনে কি সন্দেহ দেখা দিয়েছিল?

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তকে এই 'নূতন চিন্তাপ্রসারের' মান্যপ্রতিমা (আইকন) বলতে পারি। এই 'নূতন চিন্তাপ্রসারের' মূল কথা, ধর্মের চেয়ে মানুষ বড়ো, আত্মবাক্সের চেয়ে যুক্তি। রামমোহনে (১৭৭৪-১৮৩৩) যা ছিল নবাবদুর, ঈশ্বরচন্দ্র (১৮২০-১৮৯১) এবং অক্ষয়কুমারে (১৮২০-১৮৮৬) তা মহীরুহ। কিন্তু শাস্ত্রীমশাই যখন বাঙালি

চিন্তাজগতের গতিপ্রকৃতির একটা দিকনির্ণয় করতে চাইছেন সেই সময় থেকেই বাংলায় ধর্মবিযুক্ত (সেকিউলার) মানবতাবাদ রক্ষণাত্মক হতে শুরু করেছে। অল্পকালের মধ্যেই তা আগ্রাসী, পুনরুজ্জীবনবাদী হিন্দুধর্মের প্রবক্তাদের তীব্র আক্রমণের মুখে কার্যত পরাজয় স্বীকার করেন নোবে। বিজয়ী ধর্মবাদীদের সেই আক্রমণের প্রধান সেনাপতি নরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৩-১৯০২) যিনি প্রথমে স্বামী বিবিদিশানন্দ নাম নিয়ে সম্মানসূচী হন; পরে রাজস্থানের খেতরির রাজা অজিত সিংহ তাঁর নাম দেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি প্রচার করলেন, সবার উপরে মানুষ নয়, ধর্ম বড়ো; মানুষ জন্ম থেকেই ধর্মের পায়ে বলি প্রদত্ত; সব ধর্মের সেরা ধর্ম ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক হিন্দু ধর্ম, সব দর্শনের সেরা দর্শন দক্ষিণ ভারতের শঙ্করের অদ্বৈতবাদ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত যদি হন ধর্মবিযুক্ত মানবতাবাদের মান্যপ্রতিমা, তাহলে বিবেকানন্দ হলেন ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক পুনরুজ্জীবনবাদের মান্যপ্রতিমা।

দক্ষিণ ভারত : বিশুদ্ধ হিন্দু-স্থান

বিবেকানন্দের 'ইতিবাচক' এবং পেশিনির্ভর নব্য হিন্দুধর্মের কর্মকাণ্ড ও পরিকল্পনায় দক্ষিণ ভারতের ভূমিকাটি ছিল বিশিষ্ট, কেননা —

- এই দক্ষিণ মূলুক, মুসলমান রাজত্বের সময় এবং তার কত দিনের আগে থেকেও হিন্দু ধর্ম বাঁচিয়ে রেখেছে। এই দক্ষিণ মূলুকেই - সামনে টিকি, নারকেল-তেল থেকে জাতে শঙ্করাচার্যের জন্ম;এঁদেরই পায়ে নীচে বর্তমান হিন্দুধর্ম। ...এই দক্ষিণদেশেই যখন উত্তরভারতবাসী 'আল্লাহ আকবর, দীন দীন' শব্দের সামনে ভয়ে ধনরত্ন, ঠাকুর-দেবতা, স্ত্রী-পুত্র ফেলে ঝোড়েজঙ্গলে লুকুচ্ছিল, [তখন] রাজচক্রবর্তী বিদ্যানগরধিপের অচল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।^২

এই সঙ্গে আমরা যোগ করতে পারি, এই দক্ষিণদেশেই, খোদ মাদ্রাজে, দক্ষিণ ভারতের সাধারণ মানুষের দুর্বল দেহ দেখে ব্যথিত হয়ে, ফুটবল ও গীতা সম্বন্ধে বিবেকানন্দ তাঁর সেই নাটকীয় উক্তিটি করেন :

- গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হইবে। আমাকে অতি সাহসপূর্বক এই কথাগুলি বলিতে হইতেছে; কিন্তু না

বলিলেই নয়। আমি তোমাদিগকে ভালোবাসি। আমি জানি, পায়ে কোথায় কাঁটা বিধিতেছে। তোমাদের বলি, তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মহতী প্রতিভা ও মহান্ বীর্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে।^৩

'জাতিভেদ প্রথা একটি কল্যাণকর ব্যবস্থা'

১৮৯৩ সালে তিনি খেতরি-রাজের আনুকূল্যে আমেরিকা যান। তারপর আমেরিকা ও ইউরোপ ভ্রমণ সেরে ১৮৯৭ সালে সিংহল হয়ে ফেরেন দক্ষিণ ভারতের পাদ্রানে। সেখান থেকে রামনাদ, মাদুরা প্রভৃতি জায়গা হয়ে আসেন মাদ্রাজে, লাভ করেন তাঁর 'জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনন্দন'। ঐ সময় '৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭ ডিসেম্বর থেকে এগমোর ট্রেনে যেতে যেতে' মাদ্রাজ মেলের সাংবাদিককে তিনি একটি সাক্ষাৎকার দেন। সেটি ঐ দিনেরই মাদ্রাজ মেলের সাক্ষ্য সংস্করণে প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি বলেন :

- জাতিভেদ প্রথার উঁচু-নিচু ভেদ সমান করার পক্ষপাতী আমি নই। জাতিভেদ প্রথা একটি কল্যাণকর ব্যবস্থা। জাতিভেদ প্রথা আমরা মেনে চলতে চাই। জাতিভেদ প্রথা কি তা দশ লক্ষও একজন বোঝে না। জগতে কোনও দেশ নেই যেখানে জাতিভেদ নাই।^৪

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে, বিশেষত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো মুক্ত পুঁজিতান্ত্রিক উদ্যোগের দেশে, জাতিভেদ প্রথা কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অনুশাসনের সঙ্গে যুক্ত, তা অবশ্য তিনি ব্যাখ্যা করেন না। কখনো কখনো মনে হয়, সমাজের শ্রেণীভেদ আর জাতিভেদকে যেন একই চোখে দেখছেন তিনি। লভনে একটি সভায় তিনি বলেন :

- সম্পূর্ণ সমতা পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। ইহা এক পক্ষের যুক্তি, প্রত্যেক দেশে বিভিন্ন সময়ে শুধু ভাষার পরিবর্তনের দ্বারা ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে; ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণ যখন জাতিবিভাগ সমর্থন করিতে চান, তখন বলেন, জাতিবিভাগ বিলুপ্ত হইলে সমাজ ধ্বংস হইবে এবং সগর্বে এই ঐতিহাসিক সত্য উপস্থাপিত করেন যে, ভারতীয় ব্রাহ্মণশাসিত সমাজই সবচেয়ে দীর্ঘায়ু।^৫

এ যেমন 'একপক্ষের বক্তব্য', তেমনি বিবেকানন্দেরও মত।

অবশ্য পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথাও জানান, যদিও জাতিভেদ একটি কল্যাণকর

প্রথা, তবু শেষ পর্যন্ত এর অবসানই তাঁর অভীষ্ট :

- ভারতে জাতিভেদ প্রথা থেকে এমন একটি অবস্থায় আমরা যেতে চাই যেখানে জাতিভেদ নাই। জাতিভেদ প্রথার ভিত্তিই তাই। ভারতের আদর্শ, সবাইকে ব্রাহ্মণতন্ত্রে উন্নীত করা, ব্রাহ্মণ মনুষ্যজাতির আদর্শ। ভারতে ইতিহাস পড়ে দেখবেন নীচুদের উন্নত করার প্রচেষ্টা হয়েছে। অনেক শ্রেণীই উন্নত হয়েছে, আরও অনেকে হবে, যতদিন না সবাই ব্রাহ্মণ হয়। এটাই পরিকল্পনা। কাউকে টেনে নীচে না নামিয়ে সবাইকে উন্নত করতে হবে। ব্রাহ্মণদেরই এটি প্রধানত করতে হবে। কারণ সব অভিজাতবর্গেরই নিয়ম তাদের নিজেদের কবর খনন করে যাওয়া। যত তাড়াতাড়ি এটি ঘটে, ততই মঙ্গল।

ভারতের জাতিভেদ প্রথাকে পাশ্চাত্যের জাতিভেদ প্রথার চেয়ে 'অনেক ভালো' বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন :

- জাতিভেদ প্রথা না থাকলে [ভারতে] ইউরোপীয়ানদের শিক্ষণীয় কিছুই থাকত না। মুসলিমরা সব ধ্বংস করে দিত।*

কিন্তু তিনি স্বীকার করেন, মুসলমান রাজত্বে 'যে সবই মন্দ ছিল তাহা নহে। মুসলমানের ভারতাত্মিক দরিদ্র পদদলিতদের উদ্ধারের কারণ হইয়াছিল। এ দরিদ্র্য ও অবহেলার জন্যই আমাদের এক পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান হইয়া গিয়াছে। কেবল তরবারির বলে ইহা সাধিত হয় নাই।' এই কথা বলে তিনি দক্ষিণীদের সাবধান করে দিয়ে বলেন :

- আর তোমরা যদি সাবধান না হও, তবে মাদ্রাজের পঞ্চমাংশ, এমনকি অর্ধেক লোক খ্রীষ্টান হইয়া যাইবে। মালাবার দেশে আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা অপেক্ষা অধিক আশঙ্কাজনক আর কিছু কি থাকিতে পারে? 'পারিয়া' বোচারাকে উচ্চবর্ণের সঙ্গে এক রাস্তায় যাইতে দেওয়া হয় না, কিন্তু যে মুহূর্তে সে খ্রীষ্টান হইয়া পূর্বনাম বদলিয়া একটা বা হোক ইংরাজী নাম পইল বা মুসলমান হইয়া মুসলমানী নাম লইল, আর কোন গোল নাই, সব ঠিক।*

এর জন্য মালাবারবাসীদের প্রচণ্ড তিরস্কার করার পর তিনি পরামর্শ দেন: 'বিভিন্ন জাতির মধ্যে দ্বৈষ-দ্বন্দ্ব আর থাকা উচিত নয়।' অস্পৃশ্যতার মতো এতবড়ো অমানবিক প্রথার অবসান ঘটাতে হবে 'দ্বৈষ-দ্বন্দ্ব' বিনা, এই তাঁর বক্তব্য।

জাতিভেদ প্রথার ভয়াবহ দিকগুলোকে একটুও অস্বীকার করেন না তিনি, বলেন, 'ইহা প্রাচীন আসুরিক প্রথা সন্দেহ নাই।' কিন্তু তার মতে ওটা জাতিভেদ প্রথার আসল পরিচয় নয়, ওটা আদিম সমাজের বিচ্ছিন্নতা। ভারতীয় বর্ণসমাজ যত এগিয়েছে, ততই এই বিচ্ছিন্নতা শুধরে নিয়েছে :

- পরবর্তী স্মৃতিসমূহে আবার দেখিবে, শূদ্রের প্রতি ব্যবহারের কঠোরতা কিছু কমিয়াছে - 'শূদ্রগণের প্রতি এই নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রয়োজন নাই, কিন্তু তাহাদিগকে বেদাদি শিক্ষা দিবে না।'

আরো পরে আমরা দেখতে পাই :

- 'যদি শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের আচারব্যবহার অনুকরণ করে, তাহারা ভালোই করিয়া থাকে, তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া উচিত।'

এইভাবে এগোতে এগোতে শেষ পর্যন্ত শূদ্র-ব্রাহ্মণ সম্পর্ক কী দাঁড়াল, শূদ্ররা সমাজের কী কী অধিকার লাভ করল, অন্যান্য বর্ণের নিরিখে তাদের সামাজিক মর্যাদা কতটুকু বাড়ল, সে বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত জানবার জন্য আমরা উৎসুক হয়ে উঠি। কিন্তু তিনি বলেন, 'তাহা বুঝিবার সময় আমার নাই; কিন্তু এ বিষয়ে স্পষ্ট ঘটনা বিচার করিয়া দেখিলেও বুঝিতে পারা যায় যে, সকল জাতিকেই ধীরে ধীরে উঠিতে হইবে।'

এখানে মূল কথাটা হল : 'ধীরে ধীরে উঠিতে হইবে।' বর্ণসমাজের হিতাবস্থা থেকে কোনোরকম দ্রুত বিচলন তাঁর অনভিপ্রেত।

বিবেকানন্দের মতে, জাতিভেদ প্রথার মধ্যে যত ঘৃণ্য উপাদানই থাক, সব মিলিয়ে তার ফল নেতিবাচক নয়। তার মধ্যে যা কিছু নোংরা আছে তাকে সরিয়ে ফেলতে হবে জাতিভেদের কাঠামোটাকে অটুট রেখে শুধু নয়, বরং আরো শক্তিশালী করে। আর যেহেতু ব্রাহ্মণদের মধ্যেই জাতিভেদের শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলো মূর্ত হয়ে উঠেছিল, তাই জাতিভেদ প্রথার এই আধুনিক পুনর্গঠনেও প্রধান ভূমিকা থাকবে ব্রাহ্মণদেরই। কার্যত তাঁর এই যুক্তি ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের হয়ে অন্য জাতিদের প্রতি কঠিন তিরস্কারে পর্যবসিত হয় :

- ব্রাহ্মণ যে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার অপরাধ কি? অন্য জাতিরা কেন জানলাভ করিল না, কেন তাঁহাদের মতো অনুষ্ঠান করিল না? কেন তাহারা প্রথমে

অঙ্গসভাবে চূপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া ব্রাহ্মণদিগকে জয়লাভের সুযোগ দিয়াছিল?''

দক্ষিণাত্যের মুসলমান ছোঁয়াচ-বর্জিত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁর আবেদন :

- শত শতাব্দীর সঞ্চিত শিক্ষা ও সংস্কার - তাঁহারা এতদিন যাহার রক্ষক হইয়া আছেন, তাহা আজ সর্বসাধারণকে দিতে হইবে; তাঁহারা সর্বসাধারণকে উহা এতদিন দেন নাই বলিয়াই মুসলমান আক্রমণ সম্ভব হইয়াছিল।

আর ১৯৮৭ সালের দক্ষিণাত্যের

- ব্রাহ্মণের জাতিকে আমি বলিতেছি - অপেক্ষা কর, ব্যস্ত হইও না। সুবিধা পাইলেই ব্রাহ্মণজাতিকে আক্রমণ করিতে যাইও না। কারণ, আমি তোমাদিগকে দেখাইয়াছি, তোমরা নিজেদের লোকেই কষ্ট পাইতেছ। তোমাদিগকে আধ্যাত্মিকতা অর্জন করিতে ও সংস্কৃত শিখিতে কে নিষেধ করিয়াছিল? এতদিন তোমরা কি করিতেছিলে? কেন তোমরা এতদিন উদাসীন ছিলে? আর অপরে তোমাদের চেয়ে অধিক মস্তিষ্ক, অধিক বীর্য, অধিক সাহস ও অধিক ক্রিয়াশক্তির পরিচয় দিয়াছে বলিয়া এখন বিরক্তি প্রকাশ কর কেন?''

পরিবর্তনকারী বাংলা বনাম 'স্বাভাবিক' মাদ্রাজ

এ কার কণ্ঠস্বর? কাদের মুখপাত্র তিনি? ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের পক্ষে এমন অবুষ্ঠ ওকালতি বিরল। বিবেকানন্দ সচেতনভাবেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমারের চিন্তাধারার বিরোধিতা করছেন। নইলে ১৮৯৭ সালে মাদ্রাজের ভিক্টোরিয়া হলে প্রদত্ত 'আমার সমরনীতি, (My plan of Campaign) বক্তৃতায় কেন বলবেন যে -

- মাদ্রাজের এখন বড়ই সুন্দর অবস্থা। বাঙলায় যেমন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিয়াছে, এখানে তাহা সেরাপ হয় নাই। এখানে বরাবর ধীর অথচ নিশ্চিতভাবে সর্ববিষয়ে উন্নতি হইয়াছে, এখানে সমাজের ক্রমশঃ বিকাশ হইয়াছে, কোনরূপ প্রতিক্রিয়া হয় নাই। অনেক স্থলে এবং কতক পরিমাণে

বাঙলা দেশে পুরাতনের পুনরুত্থান হইয়াছে বলা যাইতে পারে, কিন্তু মাদ্রাজের উন্নতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবে হইতেছে।''

আবার স্মরণ করি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে। ১৮১৬ থেকে ১৮৮৬-এর মধ্যে যেসব পুণ্যশ্লোক মনীষী বাঙালি চেতনাকে জাভ্যমুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, অশান্তিকে বরণ করতে শিখিয়েছিলেন -

- আমরা যাহা হইয়াছি ও হইতেছি তাঁহাদেরই কৃপায়, তাঁহাদেরই অধ্যবসায়ের গুণে, তাঁহাদেরই উচ্চসমনার ফলে। কিন্তু তাঁহারা যে পরিবর্তন সাধন করিয়া তুলিয়াছেন, এমন পরিবর্তন কি আর কখনো হইয়াছিল ... ? যত ভাব তাঁহাদের সমবেত পরিশ্রমে বাংলায় ছড়িয়া পড়িয়াছে, এত কি আর কখনো কোনো দেশে কোনো কালে ছড়িয়া পড়িয়াছিল।

ঠিক এই পরিবর্তনটারই বিরোধিতা করছেন বিবেকানন্দ, সেটাকেই বলছেন 'ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া' এবং মাদ্রাজে সেটা ঘটেনি দেখে তিনি আনন্দিত। তিনি একথাও সানন্দে বলেন যে, 'অনেক স্থলে এবং কতক পরিমাণে বাঙলা দেশে পুরাতনের পুনরুত্থান হইয়াছে'। অর্থাৎ বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমারদের ধর্মবিযুক্ত মানবতাবাদের ধারাটাকে রুখে দেওয়া গেছে। দুটো পরস্পর-প্রতিক্রিয়া প্যারাডাইমের খেলা এখানে দেখতে পাচ্ছি: একদিকে অহিংস, বিন্দুত, প্রশান্ত, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎমুখী মানবচেতনা; অন্যদিকে অবিযুক্ত, প্রশান্তিরোধী, আপ্তবাক্য-সমৃদ্ধ, মৌলিক পরিবর্তন-বিরোধী ভাবনা। বিবেকানন্দ দ্বিতীয়টির প্রতিভূ।

এখানেই শেষ নয়। দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণের জাতিদের উদ্দেশে অবিশ্বাস্য এক 'যুক্তি'র অবতারণা করেন তিনি :

- তোমরা সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হও না কেন? তোমরা ভারতের সকল বর্ণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় কর না কেন? আমি তোমাদিগকে ইহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। যখনই এইওলি করিবে, তখনই তোমরা ব্রাহ্মণের তুল্য হইবে। ভারতে শক্তিবাহুর ইহাই রহস্য।

জাতিভেদ প্রথার শীর্ষে অসীন ব্রাহ্মণরাই খাঁদের সংস্কৃত শিক্ষার পথ বন্ধ করে দিয়াছিলেন, তাঁরাই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সকল বর্ণের জন্য সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন - তবেই বিবেকানন্দের মতে তাঁদের ব্রাহ্মণের সমতুল্য হবার দাবি যুক্তিযুক্ত হয়ে উঠবে।

শুধু তাই নয়, ১৮৯৭ সালের দক্ষিণাভ্যে ব্রাহ্মণদের যদি ‘মাথার খাম পায়ে ফেলিয়া অঙ্গের সংস্থান করিতে হয় তবে তাহাদিগের জ্ঞানচর্চার বিশেষ ব্যাঘাত হইবে ও সমগ্র হিন্দুজাতি তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।’^{১০}

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, একই মানুষ যখন ১৮৯৭-এর ২৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় বক্তৃতা দেন তখন মতাদর্শগত দিকে থেকে প্রায় একই কথা বললেও যুক্তিকে অবাস্তবের সীমায় টেনে নিয়ে যান না :

- মাদ্রাজে যদি কোনও ব্যক্তি খাদ্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তবে উচ্চবর্ণের লোকেরা সেই খাদ্য ফেলিয়া দিবে। কিন্তু তথাপি সেখানকার লোকেরা এইরূপ খাদ্যখাদ্য বিচারের দরুন যে বিশেষ কিছু উন্নত হইয়াছে, তাহা তো দেখিতে পাইতেছি না। যদি কেবল এ-খাওয়া ও-খাওয়া ছাড়িলেই এর তার দৃষ্টিদোষ হইতে বাঁচিলেই লোকে সিদ্ধ হইত তবে দেখিতে মাদ্রাজে সকলেই সিদ্ধপুরুষ, কিন্তু তাহা নহে।

তিনি খোলাখুলিই বলেন : ‘এ দেশে এখন সেই চাতুর্ভর্য্য কোথায়? আমার কথার উত্তর দাও। আমি চাতুর্ভর্য্য দেখিতে পাইতেছি না’^{১১}। কলকাতার বিবেকানন্দ আর দক্ষিণ ভারতের বিবেকানন্দ যেন দুই আলাদা মানুষ।

তবে বাহ্যত যতটা আলাদা মনে হয়, আসলে কিন্তু তা নয়। কেননা ১৮৯৮ সালে ভারতীয় হিন্দু সমাজ থেকে জাতিভেদের অন্যায়গুলি ‘দূর’ করার এক বিচিত্র পন্থার কথা যখন বলেন, তখন তিনি আবার সেই অবাস্তবের সীমায় চলে যান -

- আমার কথা হচ্ছে তুই বামুন, অপর জাতের অন্ন নাই খেলি; কিন্তু তুই সব বামুনের অন্ন কেন খাবি? তোরা রটিশ্রেণী বলে বারেন্দ্র বামুনের অন্ন খেতে আপত্তি হবে কেন? আর বারেন্দ্র বামুনরাই বা তোদের অন্ন না খাবে কেন? মারাঠী, তেলঙ্গী ও কনোজী বামুনরাই বা তোদের অন্ন খাবে না কেন?

সব বামুনরা সব বামুনের, সব কায়তরা সব কায়তের, অন্ন খাবে, তাহলেই তাঁর মতে জাতিভেদ দূর করা যাবে। অর্থাৎ জাতিভেদের জাত-ভাগাভাগির কাঠামোটাকে

পুরোপুরি বজায় রেখে একই জাতের মধ্যে বিভেদটুকু ঘোচালেই তিনি সন্তুষ্ট। এখানেই শেষ নয়, চলতি জাতিভেদকে উন্নত রূপ দিয়ে প্রাচীন বর্ণশ্রমকে নতুন করে ফিরিয়ে আনার কথা বলেন তিনি:

- স্ববিগণের মত চালাতে হবে; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষির মন্ত্রে দেশটাকে দীক্ষিত করতে হবে। তবে সময়োপযোগী কিছু কিছু পরিবর্তন করে দিতে হবে। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার ভাগে দেশের লোকগুলোকে ভাগ করতে হবে। সব বামুনকে এক করে একটি বামুনজাত গড়তে হবে। এইরূপ সব ক্ষত্রিয়, সব বৈশ্য সব শূদ্রদের নিয়ে অন্য তিনটি জাত করে সকল জাতিকে বৈদিক প্রণালীতে আনতে হবে। নতুবা, শুধু ‘তোমায় ছোঁব না’ বললেই কি দেশের কল্যাণ হবে রে? কখনই নয়।^{১২}

১. পদসংহার

অতএব আমরা বলতে পারি ১) বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমারের মধ্য দিয়ে বাংলায় যে ধর্মবিযুক্ত, বিজ্ঞানমুখী মানবতাবাদের ধারা জন্মে বেগবান হচ্ছিল, তার গতিপথ ঘুরিয়ে দেওয়ার কাজে বিবেকানন্দ অগ্রণীর ভূমিকা নেন। ২) দক্ষিণ ভারতের মুসলমান-ছোঁয়াচ বর্জিত ব্রাহ্মণ্যতত্ত্বকে তিনি হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের প্রধান খুঁটি বলে মনে করেছিলেন। ৩) শূদ্রদের ওপর ব্রাহ্মণদের অমানুষিক অত্যাচারগুলোকে (যার প্রকোপ দক্ষিণ ভারতেই সবচেয়ে বেশি ছিল) তিনি অবশ্যই অন্যায় বলে স্বীকার করতেন, কিন্তু জাতিভেদ প্রথার কাঠামো বজায় রেখেই তার দোষগুলো শুধরে নেওয়া উচিত ও কাম্য বলে মনে করতেন। ৪) পরিশোধিত জাতিভেদ প্রথাকে বিশুদ্ধ রূপে পাতিত করে নিয়ে তিনি নতুন এক বর্ণশ্রমিক সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখতেন। ওটাই তাঁর মতে ভারতের ভবিষ্যৎ।

সূত্রনির্দেশ

১. সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিবিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য(সম্পাদ), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১, পৃষ্ঠা ৫০৯-৫১০
২. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৯৬২, ৬৮৪। এর পর থেকে বাণী ও রচনা নামে উল্লিখিত।
৩. বাণী ও রচনা, ৫:১৩৪। এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ-গবেষক রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের একটি

চমৎকার মন্তব্যের উদ্ধৃতি দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না : 'স্বামীজীর এই 'জায়ালাগ' নতুন যুগের সূচনা করেনি কেন? আন্তর্জাতিক যুটবলে ভারতের স্থান ১২০-র কাছাকাছি হবে [২০০১-এর হিসেবে]। ... কথাগুলি স্বামীজী মাত্রাঙ্গে বলেছিলেন, তাদেরও তেমন যুটবলে আগ্রহ লক্ষিত হয় না।' (রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা থেকে কামাখ্যা: বিবেকানন্দের অভ্যর্থনা, লেখক-প্রকাশিত, কলকাতা ২০০১, পৃষ্ঠা ১০৫)। কেউই কি তাহলে সিরিয়াসলি নেয়নি কথাটাকে?

৪. রাজাগোপাল পৃষ্ঠা ৭১-৭২

৫. বাণী ও রচনা, ৩:৩৪৫

৬. রাজাগোপাল, পৃষ্ঠা ৭১-৭২

৭. বাণী ও রচনা, ৫:১৯১

৮. ঐ

৯. বাণী ও রচনা, ৫:১৯৩

১০. বাণী ও রচনা, ৫:১০০

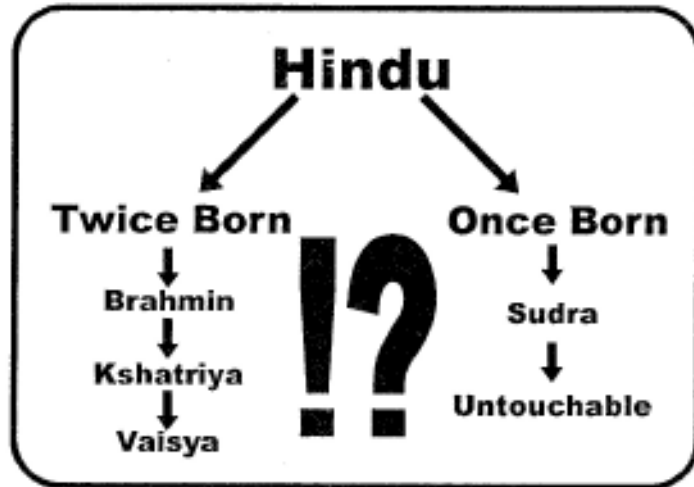
১১. ঐ

১২. বাণী ও রচনা, ৫-১০০

১৩. বাণী ও রচনা, ৫:২০৩

১৪. বাণী ও রচনা ৫:২০৬

১৫. বাণী ও রচনা, ৯:১৫৫-১৫৪



বিবেকানন্দ : সংস্কৃতায়নের প্রথম তাত্ত্বিক?

কণিষ্ক চৌধুরী

আধুনিককালে সংস্কৃতায়ন (sanskritization) শব্দটির সাথে সকলেই কমবেশি একরকম পরিচিত, বিশেষ করে সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জগতে। এম. এন. শ্রীনিবাস ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ডক্টরাল থিসিসে এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করলেও প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও সেই একই সময়ে এই শব্দ ও ধারণার ব্যবহার করেছিলেন। (Chatterjee 1974)। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, শ্রীনিবাস ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়েরও আগে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়াটির কথা উল্লেখ করেছিলেন। যদিও 'সংস্কৃতায়ন' শব্দটি তিনি ব্যবহার করেন নি। (দত্ত ২০০৭)। এনাদেরও প্রায় ৫০ বছর পূর্বে বিবেকানন্দ সংস্কৃতায়ন শব্দটি ব্যবহার না করেও ভারতীয় সমাজে ক্রিয়াশীল এই প্রক্রিয়াটিকে লক্ষ্য করেছিলেন এবং প্রক্রিয়াটিকে আদর্শায়িত করে তার সার্বিক প্রয়োগ চেয়েছিলেন।

সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়াটির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শ্রীনিবাস বলেছেন,

"Sanskritization is the process by which a 'Low' Hindu caste, or tribal or other group, changes its customs, ritual, ideology and way of life in the direction of a high, and frequently, 'twice-born' caste. Generally such changes are followed by a claim to a higher position in the caste hierarchy than that traditionally conceded to the claimant caste by the local community." (2001:6)।

এই সংজ্ঞায় দেখানো হয়েছে যে, (তথাকথিত) নিম্ন বর্ণজাতি বা উপজাতি গোষ্ঠীগুলি সংস্কৃতায়ন নামক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে (তথাকথিত) উচ্চ বর্ণ বা দ্বিজদের আচার, প্রথা, মতাদর্শ জীবনধারার অনুকরণ করে নিজেদের পরিবর্তন ঘটায়, এই লক্ষে যে, যাতে করে তারা স্থানীয় সম্প্রদায়ের সমবর্ণ-জাতিভুক্ত-মানব গোষ্ঠীগুলির তুলনায় অধিকতর মর্যাদালাভের দাবি করতে সক্ষম হয়।

শ্রীনিবাস 'ব্রাহ্মণকরণ' শব্দটির থেকে 'সংস্কৃতায়ন'কে অনেক বেশি পরিমাণে উপযুক্ত বলে মনে করেছিলেন প্রধানতঃ দুটি কারণে — প্রথমত, সংস্কৃতায়ন শব্দটি অনেক বেশি ব্যাপক এবং ব্রাহ্মণকরণ প্রক্রিয়াকে (সংকীর্ণ ধারণা হিসেবে) অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম। দ্বিতীয়ত, এই প্রক্রিয়ায় অনুসৃত উর্দ্ধবর্ণ সবসময়ে ব্রাহ্মণ নাও হতে পারে (2002: 10)। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় খাসিয়া, স্যানতেং ও বোড়ো জাতির সাংস্কৃতিক হিন্দুত্বকরণের উপর আলোকপাত করে দেখিয়েছেন, কিভাবে অনার্য ভাষা গোষ্ঠী ও উপজাতিগুলি ব্যাপক ভারতীয়ত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পরে এক সমন্বিত সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের সৃষ্টি করেছে (2004:27, 72, 93)। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি চর্চায় বিষয়টিকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণতা লক্ষ্য করা যায় নৃতাত্ত্বিক নির্মল কুমার বোসের রচনায়। তিনি দেখিয়েছেন যে, আর্য বা ব্রাহ্মণ সভ্যতার অঙ্গনে নিম্নজাতিগুলির অন্তর্ভুক্তি ঘটে এই সংস্কৃতায়নের মধ্যে দিয়েই (1996:168)। যোগেন্দ্র সিং শ্রীনিবাসকে অনুকরণ করেও সংস্কৃতায়নের সংজ্ঞার তুলনামূলক বিস্তার ঘটিয়েছেন :

"Sanskritization denotes contemporaneous processes of Cultural imitation of upper castes by lower castes or subcastes, in different parts of India" (1971)

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও এম. এন. শ্রীনিবাস উভয়েই তাদের ধারণার ভিত্তি শব্দ হিসেবে সংস্কৃত (ভাষার নাম) কে গ্রহণ করেছিলেন। উভয়ের কাছেই সংস্কৃতায়নের ধারণাটি সংস্কৃতের (ভাগ) মধ্যে নিহিত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের সাথে যুক্ত (Shah, 2005:239)। আরও সুনির্দিষ্ট করে বলা যায় যে, সংস্কৃতায়নের ধারণাটি সাংস্কৃতিক হিন্দুধর্মের ধারণার সাথে যুক্ত। এই হিন্দু ধর্মটি হলো ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যস্ত একটি কাঠামো। শ্রীনিবাস নিশ্চয়ই তা লক্ষ্য করেছিলেন এবং তাই তিনি দেখিয়েছিলেন যে, সংস্কৃতায়ন স্বাভাবিকভাবেই উন্নত ও আনুভূমিক চরিত্র বিশিষ্ট। যখন এক বা একই ধরনের প্রথা (ritual) অনুশীলিত হয়, তখন আনুভূমিক সংস্কৃতায়ন ঘটে। আবার যখন একটি সমগোষ্ঠীয় ভাষা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন অঞ্চলে সংস্কৃতি ও প্রথা বিভিন্ন জাতের দ্বারা অনুশীলিত হয় তখন সংস্কৃতায়নের উন্নত প্রসার দেখতে পাওয়া যায় (Singer, 1972:44)। সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার তাৎপর্যপূর্ণ দিকটি এর প্রসারের দিকে লক্ষ্য রাখলেই ধরা পড়ে। উন্নত বা আনুভূমিক উভয় ক্ষেত্রেই যে পরিবর্তন ঘটে তা হল অবস্থানগত, কাঠামোগত নয়। আর মজাটা হল এখানেই যে, এই ধরনের মবিলিটি একটা চূড়ান্ত বৈষম্যমূলক অন্যায় কাঠামো

সংরক্ষণে সহায়তা করে। অর্থাৎ বৈষম্যমূলক জাতিভেদ-বর্ণভেদমূলক ব্যবস্থাতিকে স্থায়ী করে এবং দ্বিতীয়ত, নতুন নতুন জাতি (caste)-এর জন্ম দিয়ে বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

হিন্দু ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি যেহেতু বর্ণ জাতিভেদ ব্যবস্থা তাই তাকে সংরক্ষণের পক্ষে হিন্দু ধর্মের সাবেকী ও আধুনিক ভাষাকরণ নিজেদের মত করে যুক্তি সাজিয়েছেন। বিবেকানন্দ এই ঘরানারই সদস্য। বাজারে প্রচলিত ধারণাটি কিন্তু এমন নয়। বিবেকানন্দ ভক্তগণ দেখানোর চেষ্টা করেন যে তাদের উপাস্য গুরু বিবেকানন্দ জাতিভেদ প্রচার বিরোধী ছিলেন। তা যে নিজেরা অসত্য তা তাঁর বাণী ও রচনা পাঠ করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর বাণী ও রচনায় কোথাও কোথাও ব্রাহ্মণদের মূদু সমালোচনা থাকলেও বর্ণ-জাতিভেদের সপক্ষেই সর্বাধিক সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। 'আর্য ও তামিল' নামক প্রবন্ধে বিবেকানন্দ সরাসরি বর্ণ-জাতিভেদকে সমর্থন জানিয়ে বলেছেন — 'আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারতবর্ষের বর্ণশ্রম ধর্ম মানবজাতিকে প্রদত্ত ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠসম্পদ সমূহের অন্যতম। আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে, অনিবার্য ক্রটিবিশিষ্ট, বৈদেশিক অত্যাচার, সর্বোপরি ব্রাহ্মণ নামের অযোগ্য কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণের পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা ও দত্তের দ্বারা বর্ণশ্রম ধর্মের স্বাভাবিক সুফল লাভ ব্যাহত হইলেও এই বর্ণশ্রমধর্ম ভারতে আশ্চর্য কীর্তি স্থাপন করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও ভারতবাসীকে পরম লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত করিবে' (২০১২ : ৫:২৯৭)। তিনি ব্রাহ্মণের সম্পর্কে উপরোক্ত যে সমালোচনা করেছেন তা সকল ব্রাহ্মণ সম্পর্কে তিনি প্রয়োগ করেন নি। ব্রাহ্মণদের জাতিগতদ শ্রেষ্ঠত্বকেই তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর কাছে ব্রাহ্মণই আদর্শ (পূর্বোক্ত : ৬৬)। তিনি তাঁর মতের স্বপক্ষে পৌরাণিক গালগল্পের সাহায্য নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা মহাভারত পাঠ করি : প্রথমে পৃথিবীর সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন; ক্রমে যতই তাঁহাদের অবনতি হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন; আবার যখন যুগচক্র ঘুরিয়া সেই সভ্যযুগের অভ্রাদয় হইবে, তখন আবার সকলেই ব্রাহ্মণ হইবেন' (২০১২ : খণ্ড ৫: ৬৬)। একই কথা অন্যত্রও বলেছেন। (পূর্বোক্ত ১৯৪৬)।

বিবেকানন্দের বাণী ও রচনায় যত্নতর ছড়িয়ে রয়েছে এই ধারণা। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বলেছেন, '.....জাতিবিভাগ অনন্তকালের জন্য থাকিয়া যাইবে। সমাজের প্রকৃতিই এই বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া।..... জাতিবিভাগ প্রাকৃতিক নিয়ম।..... জাতিবিভাগ ভাল জিনিস। জীবনসমস্যা সমাধানের ইহাই একমাত্র স্বাভাবিক উপায়। লোকে নিজেদের

মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করিবে; ইহা অতিক্রম করিবার উপায় নাই। যেখানেই যাও, জাতিবিভাগ থাকিবেই' (পূর্বোক্ত ১০৫-৬)। তিনি 'জাতিভেদ থাকিবেই' বলেও এটিকে একটি 'সমস্যা' হিসেবে বিবেচনা করে তার মীমাংসা করেছেন এইভাবে : 'উচ্চবর্ণগুলিকে হীনতর করিতে হইবে না, ব্রাহ্মণজাতিকে ধ্বংস করিতে হইবে না। ভারতে ব্রাহ্মণই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ — শঙ্করাচার্য তাঁহার গীতাভাষ্যের ভূমিকায় ইহা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কারণ বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ইহাই তাঁহার অবতরণের মহান উদ্দেশ্য। এই ব্রাহ্মণ, এই দিব্যমানব, ব্রাহ্মজ পুরুষ, এই আদর্শ ও পূর্ণমানবের প্রয়োজন আছে; তাঁহার লোপ হইলে চলিবে না। আধুনিক জাতিভেদ প্রথার যতই দোষ থাকুক, আমরা জানি - ব্রাহ্মণ জাতির পক্ষ হইয়া এইটুকু বলিতে হইবে যে, অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তাঁহাদের মধ্যেই অধিকতর সংখ্যায় প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বসম্পন্ন মানুষের জন্ম হইয়াছে, ইহা সত্য। অন্যান্য জাতির নিকট ব্রাহ্মণদের এ গৌরবটুকুই প্রাপ্য (২০১২ : ৫ : ১৪৬-৪৭)।

বিবেকানন্দকে অনুসরণ করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যস্ত বর্ণ-জাতিভেদ ব্যবস্থা ভারতীয় সভ্যতার একটি দৈর্ঘ্যপ্রদত্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাই তাকে রক্ষা করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, ব্রাহ্মণ হলো চতুর্বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তৃতীয়ত, জাতিভেদ প্রথার যে সমস্যাগুলি রয়েছে তার জন্য বিবেকানন্দ প্রদত্ত দাওয়াইটি হলো : 'উচ্চতর বর্ণকে নীচে নামাইয়া এ সমস্যার মীমাংসা হইবে না, নিম্নজাতিকে উন্নত করিতে হইবে' (পূর্বোক্ত : ১৪৭)। এটাই তাঁর কাছে 'শাস্ত্রোপদিষ্ট' কার্যপ্রণালী (পূর্বোক্ত : ১৪৮)। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যস্ত বর্ণ-জাতিভেদ ব্যবস্থার একনিকে (এবং স্তরায়িত কাঠামোর উপরে থাকে) রয়েছে ব্রাহ্মণ এবং অন্যদিকে (সর্বনিম্নে) চণ্ডাল। এই চণ্ডালকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করতে হবে। বিবেকানন্দ স্মৃতিশাস্ত্র উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, শূদ্রগণ যদি ব্রাহ্মণের আচার-আচরণ অনুকরণ করে, তাহলে তাকে বাধা দেওয়া তো উচিতই নয়, বরং তাদের উৎসাহ দেওয়া উচিত (পূর্বোক্ত)। এই নিম্নবর্ণের উচ্চবর্ণকে অনুকরণ প্রক্রিয়া ভারতবর্ষে অতীতে দেখা গেছে এবং এর মধ্যে দিয়ে বহু জাতি ব্রাহ্মণ জাতিতে উন্নীত হয়েছে এবং হচ্ছে। তিনি 'ভারতের ভবিষ্যৎ' নামক রচনায় এ ঘটনার তথ্যপ্রমাণ উপস্থিত করতে গিয়ে বলেছেন, 'শঙ্করাচার্য প্রভৃতি যুগাচার্যগণ — জাতিগঠনকারী ছিলেন। তাঁহারা যেসব অদ্বৈত ব্যাপার করিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাদিগকে বলিতে পারি না, আর তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ, আমি যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহাতে বিরক্ত হইতে পারো। ভারতব্রহ্মণের

অভিজ্ঞতা হইতে আমি ইহার সন্ধান পাইয়াছি, আর আমি ঐ গবেষণায় অদ্বৈত ফল লাভ করিয়াছি। সময়ে সময়ে তাঁহারা (শঙ্করাচার্য প্রমুখ) দলকে দল বেষ্টিত লইয়া এক মুহূর্তে তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় করিয়া ফেলিতেন; দলকে দল জেলে লইয়া এক মুহূর্তে ব্রাহ্মণ করিয়া ফেলিতেন' (২০১২ : খণ্ড ৫ : ১৪৯)।

ব্রাহ্মণ সহ উচ্চবর্ণকে অনুকরণ করার ধারণাকে শাস্ত্রের উপদেশ বলেই বিবেকানন্দ খামেন নি, তার সামাজিক অনুশীলনের প্রস্তাবও তিনি করেছেন। এবং এরই সাথে যুক্ত করেছেন জাতি (caste) গুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সংস্কৃত ভাষার সমাধান সূত্র। তিনি 'ভারতের ভবিষ্যৎ' নামক বক্তৃতায় বলেছেন, 'ব্রাহ্মণের জাতিকে আমি বলিতেছি — অপেক্ষা কর, বাস্তব হইও না। সুবিধা পাইলেই ব্রাহ্মণজাতিকে আক্রমণ করিতে যাইও না। কারণ আমি তোমাদিগকে দেখাইয়াছি, তোমরা নিজেদের দোষেই কষ্ট পাইতেছ। তোমাদিগকে আধ্যাত্মিকতা অর্জন করিতে ও সংস্কৃত শিখিতে কে নিষেধ করিয়াছিল? এতদিন তোমরা কি করিতেছিলে? সংবাদপত্রে এই-সকল বাদ-প্রতিবাদ, বিবাদ-বিসংবাদ বৃথা শক্তিস্বয় না করিয়া, নিজ গৃহে এইরূপ বিবাদে লিপ্ত না থাকিয়া, সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া, ব্রাহ্মণ যে শিক্ষাবলে এত গৌরবের অধিকারী হইয়াছে তাহা অর্জন করিবার চেষ্টা কর, তবেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তোমরা সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হও না কেন? তোমরা ভারতের সকল বর্ণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় কর না কেন? যখনই এগুলি করিবে, তখনই তোমরা ব্রাহ্মণের তুল্য হইবে। ভারতে শক্তিবাদের ইহাই রহস্য' (২০১২ : খণ্ড ৫ : ১৫১)।

বিবেকানন্দের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ভারতে নিম্নবর্ণের অগৌরব ও হীনাবস্থার কারণ তাদের 'যথাযথ পথ' গ্রহণের ব্যর্থতা। এই 'পথ'টি হল ব্রাহ্মণকে অনুকরণ ও অনুসরণ করা। এর সাথে তিনি যুক্ত করেছেন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার কথা, কারণ সংস্কৃত ভাষা ও মর্যাদা তাঁর কাছে সমার্থক (পূর্বোক্ত)। তাই ব্রাহ্মণের জাতিগুলির উচিত সংস্কৃত ভাষা শেখা এবং সংস্কৃত ভাষার প্রচার ও প্রসারে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা। কারণ নিম্নবর্ণ যদি এই ভাষা আয়ত্ত করতে পারে তাহলে তারাও মর্যাদাশালী হয়ে উঠবে। এবং এই ভাষা-জ্ঞান তাদের প্রতিরক্ষা বর্ম হিসেবে কাজ করবে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, বিবেকানন্দ বারংবার একটি আত্মবিরোধিতার ফাঁদে পড়ে গেছেন। সামাজিক সম্পর্কগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অস্পষ্টতা তাকে আত্মবিরোধের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। ফলে তিনি সংস্কৃতায়নের ধারণাটি প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করলেও সেই একই সূত্র ধরে তিনি

ব্রাহ্মণকরণের পক্ষেও যুক্তি খুঁজেছেন। ফলে তাঁর তত্ত্বটি হয়ে উঠেছে অসম্পূর্ণ, অপূর্ণ ও অস্বচ্ছ।

১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে 'ভারতের ভবিষ্যৎ' নামক বক্তৃতায় নিম্নবর্ণের এই upward mobility-র কথা তিনি বললেও, ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে 'বর্তমান ভারত' নামক প্রবন্ধে কিন্তু তিনি ভিন্ন সূত্রে শূদ্র জাগরণের কথা উত্থাপন করলেন। এ প্রবন্ধে তিনি শূদ্র জাগরণের প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে শূদ্রগণকেই হতমান করলেন। তিনি শূদ্রদের চিহ্নিত করলেন স্বজাতিদেহী, একতাহীন, অশিক্ষিত, বিনিম্ব হিসেবে। তাদের 'চেষ্টার তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই' (২০১২:খন্ড ৬:১৮৭)। তাহলে তাদের কি আছে? 'আছে প্রবল ঈর্ষা, স্বজাতিদেহ, আছে দুর্বলের যেন তেন প্রকারেণ সর্বনাশসাধনে একান্ত ইচ্ছা, আর বলবানের কুকুরবৎ পদলেহনে' (পূর্বোক্ত)। সেবাই শূদ্র এবং এই গুণগুলি নিয়েই শূদ্রজাগরণ হবে। বক্তৃতাপক্ষে তিনি শূদ্রজাগরণকে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মের পরিণতি হিসেবে দেখেছেন। এটা তার আকাঙ্ক্ষিত ছিল না। কারণ এ ধরনের অপগুণসম্পন্ন জাতি কখন সুশাসন ও সুসভ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, তার ভাষায়, 'শূদ্র সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে' (পূর্বোক্ত: ১৮৮) অর্থাৎ তা অবশ্যস্বাভাবিক হলেও কাম্বিত নয়। ফলে আবার প্রত্যাবর্তন করতে হয় ব্রাহ্মণত্ব ও সংস্কৃতায়নের ধারণায়। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে রচিত 'আর্য ও তামিল' প্রবন্ধে তিনি আবারও ঘোষণা করেন বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের কথা, বর্ণশ্রম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথা। এই বর্ণশ্রমই ভবিষ্যতে ভারতবাসীকে পরমলক্ষের দিকে চালিত করবে বলে তিনি সিদ্ধান্ত করেন।

আধুনিককালের সমাজতাত্ত্বিকগণ সংস্কৃতায়নকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার মূল কথাটি হল — ভারতবর্ষে সংস্কৃতায়ন নামক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই এই আবদ্ধ সমাজের মধ্য একধরনের সীমিত পরিমাণে মবিলাটি দেখা যায়। অর্থাৎ বর্ণ-জাতিভিত্তিক হিন্দু সমাজ পুরোপুরি অনড় ও অচল নয়। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিকরা এই প্রক্রিয়াটিকে ভালো বা মন্দ হিসেবে চিহ্নিত করেন না। অর্থাৎ এর উপর কোনও মূল্য আরোপ করেন না। বিবেকানন্দ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বসে এই প্রক্রিয়াটিকে ভারতীয় সমাজে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ক্রিয়া বলে উল্লেখ করে সমাজতত্ত্বের ছাত্র-ছাত্রীদের তাঁর কাছে খণী করে তুললেও যন্ত্রণাটি এইখানে যে তিনি ভারতের অসভ্য, বর্বর জাতিভেদ ব্যবস্থাকেও একই সাথে সদর্থক হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। অর্থাৎ সঠিকভাবেই ভারতে ক্রিয়াশীল

এই প্রক্রিয়াটিকে তিনি চিহ্নিত করলেও শেষ পর্যন্ত সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে তিনি পশ্চাৎগামীতাকেই সমর্থন করে বসলেন।

সংস্কৃতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যা বহু উদ্দেশ্যসাপেক্ষ। এর প্রথম কাজ হল প্রচলিত জাতিভেদমূলক ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যস্ত কাঠামোকে স্থিতিশীল করা। এখানে কোন জাত গোষ্ঠীর পরিবর্তন হয় তা একান্তভাবে অবস্থানগত, কাঠামোগত নয়। অর্থাৎ এখানে বর্ণ-জাতিভেদগত বৈষম্য কেবল স্থিতিশীল হয় না, তা আরও বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাটিকে গ্রহণযোগ্য করে তোলাও হয়। অন্যায় ব্যবস্থাটিকে এই প্রক্রিয়া নমনীয় করে তোলার পাশাপাশি একটা সীমিত প্রতিযোগিতার সুযোগও এখানে সৃষ্টি করা হয়। ব্রাহ্মণত্বের জাতিগুলিকে উপরে ওঠার সুযোগ দেওয়া হয় কেবল নিজেদের মধ্যে। বিবেকানন্দ যখন upward mobilityর কথা বলে চণ্ডালকে ব্রাহ্মণ বানাতে চান বা ক্ষত্রিয় বানাতে চান অর্থাৎ প্রক্রিয়াটি যেন এই রকম যে, যোগ্যতা অর্জনের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্ণের মানুষ ব্রাহ্মণ হতে পারবে। কিন্তু বর্ণ-জাতিগত কাঠামোয় বক্তৃত সংস্কৃতায়ন যতটুকু চলে তা হল একটি বা কয়েকটি সমসংস্কৃতিসম্পন্ন জাতের মধ্যে। ব্রাহ্মণ মডেল বা ক্ষত্রিয় মডেল গ্রহণ করার অর্থ এটি নয় যে নিম্নবর্ণ ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় আচার আচরণ অনুসরণের মধ্য দিয়ে বড়জোর সমসংস্কৃতিসম্পন্ন আঞ্চলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেদের পার্থক্য ঘোষিত হতে পারে বা উচ্চতর মর্যাদালাভ সম্ভব হতে পারে। কিন্তু মৌলিক কাঠামোর মধ্যে কোনও র্যাডিক্যাল উত্থান-পতন ঘটানো সম্ভব নয়।

বিবেকানন্দ কখনও সংস্কৃতায়ন, কখনও ব্রাহ্মণকরণের কথা বলেছেন। তিনি কিন্তু আজওবি হলেও মৌলিক কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই অর্থেই এটা আজওবি বলা হচ্ছে যে, তার প্রস্তাবিত প্রকল্প যে সব সূত্রের উপর দাঁড়িয়েছিল সেগুলি নিজেরাই ছিল সংকটাকীর্ণ।

১. ব্রাহ্মণ মনুষ্যত্বের আদর্শ।
২. ব্রাহ্মণকে অনুকরণ করে এবং সংস্কৃত ভাষা শিখেই চণ্ডাল ব্রাহ্মণত্বে পৌঁছেবে।
৩. বর্ণ-জাতিভেদ ঈশ্বরপ্রদত্ত ও তা সমর্থনযোগ্য।
৪. আদিতে সবাই ব্রাহ্মণ ছিল, ভবিষ্যতেও সবাই ব্রাহ্মণ হবে।

৫. জাতিগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় থাকবে।

৬. ব্যবস্থাটি যেহেতু আদর্শ তাই তার সক্রিয় প্রয়োগ প্রয়োজন।

প্রকৃতপক্ষে বিবেকানন্দ ফিরে যেতে চেয়েছিলেন প্রাচীন ভারতে। ফলে তাঁকে বর্ণ-জাতি কাঠামোর সংরক্ষণকেই বৈধতা দান করতে হয়েছে। না হলে প্রাচীন ভারতের অতীতচরী স্বপ্নের ভিত্তিভূমিটাই ধ্বংস যাবে। বিবেকানন্দের ধর্মচেতনা এবং তারই অনুসারী ঐতিহ্যভাবনা ও অতীতচরীতা তাকে বাধ্য দিয়েছে সমাজ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে। যথেষ্ট পরিমাণে অন্তর্দৃষ্টি ও মেধাসম্পন্ন এই মানুষটি সঠিকতার সঙ্গে হিন্দু সমাজের এই hegemonic চরিত্রটিকে ধরতে পেরেছিলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন যে কীভাবে নিম্নবর্ণ ও বর্ণের মানুষকে আত্মস্থ করে প্রচলিত সমাজকাঠামোকে স্থিতিশীলতা দিতে পারে। হয়তো ক্ষমতা কাঠামোর এই খেলাটিকেও ধরতে পেরেছিলেন। কিন্তু পরিহাস এই যে তা কোনও সদর্থক অবয়ব পেলো না। পেলো না হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত তাঁর মনন প্রক্রিয়ার জন্য। আরও একটি কারণ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল দুর্দান্ত আবেগময়তা, এবং তাৎক্ষণিকতার দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত যেমন গঠন করতে পারতেন না এবং কোনও সিদ্ধান্তে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করাও ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। একটি ক্ষেত্রেই তিনি ব্যতিক্রমী ছিলেন তা হলো হিন্দু ধর্ম। যেন তেন প্রকারেণ তাকেই মহিমাম্বিত করতে গিয়ে তাকে ভিন্ন ভিন্ন সময় পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। সংস্কৃতায়ন ধারণাটির ক্ষেত্রে একথা খুবই সত্য। বর্ণ-জাতিভেদকে সমর্থন করলেও স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণদের সমালোচনা করেছেন। 'বর্তমান ভারত' নামক প্রবন্ধে কোথাও কোথাও সেই সমালোচনা অস্বস্তিকর পর্যায়ে পৌঁছেছে। কিন্তু সেই তিনিই আবার ব্রাহ্মণত্বকে "সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলী এবং বিভিন্ন স্তরের প্রগতি ও সংস্কৃতির সমাধান" বলে চিহ্নিত করেছেন (দস্ত, ১৪০০:১৮৩-১৮৪)। কারণ ভারতের মহান আদর্শ ব্রাহ্মণত্ব।

শ্রীনিবাসের সাথে বিবেকানন্দের বিশ্লেষণের মৌলিক পার্থক্যটি হল উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। শ্রীনিবাস সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু বিবেকানন্দ একে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। সমাজে প্রচলিত এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা সংখ্যালঘু উচ্চবর্ণ ও উচ্চবর্ণেরই স্বার্থ রক্ষিত হয় এবং সংখ্যাগুরু নিম্নবর্ণ তাদের পায়ের তলায় এক অমর্যাদাকর অকর্ণনীয় যন্ত্রণাদায়ক ব্যবহার মধ্যে কোনওক্রমে টিকে থাকে আর টিকিয়ে রাখে এই মানুষকেই ব্যবস্থাটি। তাই সেই ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাটির সংরক্ষক প্রক্রিয়াটির

অবসান যেখানে কাম্য সেখানে বিবেকানন্দের প্রভাবটি হল এদেরকে টিকিয়ে রাখা, শক্তিশালী করা। ফলে যে চমৎকার অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন তা এক দুঃখজনক পরিণতি লাভ করলো। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংঘাতে ঐতিহ্য জয়লাভ করলো। কিন্তু তা কতটা সদর্থক হোল সেটাই এখন প্রশ্ন।

তথ্যসূত্র :

১. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। ২০০৪। সাংস্কৃতিকী। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
২. দস্ত ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ। ১৪০০ বাংলা। স্বামী বিবেকানন্দ। কলকাতা : নবভারত পাবলিশার্স।
৩. দস্ত ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ। ২০০৭। বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব। কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন।
৪. বিবেকানন্দ স্বামী। ২০১২। বাণী ও রচনা। খণ্ড ৫ ও ৬ কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়।
৫. Bose, Nirmal Kumar, 1996, *The Structure of Hindu Society*, New Delhi: Orient Longman
৬. Shah A.M. 2005, "Sanskritization-Revisited" in *Sociological Bulletin*, edited by N. Jayaram. vol-54, no-2, May-August 2005, New Delhi, Indian Sociological Society.
৭. Singh Yogendra. 1977. *Modernization of Indian Tradition*, Faridabad : Thomson Press(India)Limited.
৮. Srinivas, M.N. 2001, *Social Change in Modern India*, New Delhi : Orient Longman.
৯. Srinivas. 2002. *Collected Essays*. New Delhi : Oxford.
১০. Chatterjee Suniti Kumar. 1974. *Kirstajana - kriti - the Indo-Mongoloeds: Their contribution to the History and cul ture of India*. Calcutta : The Asiatic Society.

প্রসঙ্গটি অগ্রিয়

মনোরঞ্জন ব্যাপারী

অতি সম্প্রতি বাংলা ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে নিয়েছে যে শব্দটি সেটি “দলিত”। অর্থাৎ ‘যাহাকে দলন করা হইয়াছে’। দলিত যদি থাকে অবশ্যই কেউ না কেউ দলক নিশ্চয় আছে। দলক শব্দের আর এক অর্থ তো অত্যাচারি নিপীড়ক। প্রশ্ন এখানে কে কাহাকে নিপীড়ন করিয়া থাকে। করিতে পারে। বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোয় শিল্পপতি শ্রমিককে, সামন্ত তার কৃষক প্রজাকে, পুরুষ নারীকে, মালিক তার ঝি-চাকর-জুইভার-দারোয়ানকে, দজ্জাল শাণ্ডি তার নিরীহ পুত্রবধূকে, পুত্রবধূ তার বুড়ি শাণ্ডিকে। এই তালিকা বড় করতে করতে বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে, মা-বাবা-সন্তান হয়ে কোথায় গিয়ে থামবে বলা খুব মুশকিল।

বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে বিশ্বায়নের যুগে সমাজ বিন্যাস যেভাবে বদলে যাচ্ছে তাতে কোন সিদ্ধান্তই সরলরেখিক-একমুখিন রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে সেই মনুর কালের ক্রিয়া এবং কর্মের-প্রতিক্রিয়াজাত চিত্রপট সময়ের ধুলোয় যেন কিছু ধূসর বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে দিক-দিশা-প্রেক্ষাপট।

দলিত এই শব্দটির প্রথম প্রয়োগ হয় মহারাষ্ট্রে। দলিত বলতে এমন এক সম্প্রদায়কে বোঝাত—হিন্দু ধর্মের বর্ণবাদী ব্যবস্থা যাদের জন্মজনিত অপরাধে ঘোষণা করেছিল অচ্ছুৎ অস্পৃশ্য বলে। যাদের শিক্ষা-দীক্ষা, জীবনধারণের সামনে শত রকমের বাধার পাহাড় দাঁড় করিয়ে বেঁচে থাকা-বিকশিত হওয়া কঠিন করে তুলেছিল। নগরে প্রবেশের পূর্বে ঘণ্টা বাড়িয়ে জানান দেওয়া, খুঁধু ফেলার পাত্র গলায় বুলিয়ে নেওয়া, পায়ে হ্রাপ মুছে দেবার জন্য পিছনে ঝাঁটা বেঁধে রাখা, এমন ধরনের বহুবিধ অযৌক্তিক অন্যায় নির্যাতনে জীবন বিধিয়ে তোলা—সব করা হয়েছিল যাদের।

এই দেশে সেই বেদের কাল থেকে ইংরেজ শাসন — কয়েক হাজার বছর একটা বিশাল জনসম্প্রদায়ের গলায় চেপে বসে থাকে বজ্র আঁটুনির ফাঁস। জীবনের সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে তারা। আর তাদের শ্রমে-ধামে অর্জিত সম্পদ আত্মসাৎ করে ভোগবিলাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকে অল্প কিছু লোক। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য-উৎকর্ষতার সবকটি

শাখা, রাজনীতি-সমাজনীতির সবকটি ভরকেন্দ্র কুক্ষিগত করে নেয় তারা। বিশাল এই দেশটার সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের আধিপত্য। আর একদা যাদের এই দেশটার ভূমি-আকাশ-পাহাড়-নদী-অরণ্যের মালিকানা ছিল তারই পরিণত হয় মানবতের প্রাণীতে। এক কথায় যাদের বলা হয় শূত্র বা দাস। আর একটু ভদ্র ভাষায় নিম্নবর্ণ।

ইংরেজ শাসন-শোষণ এদেশের মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। যে কারণে বারবার সেই শাসককে উৎখাত করতে মূল নিবাসী-আদিবাসি মানুষরা অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

একটি ডিমের মধ্যে যখন একটি ছোট্ট প্রাণের প্রকাশ হয়, সে তার নরম দুর্বল ঠোঁট দিয়ে ঠোঁকর মেরে খোলস ভেঙে বাইরে বের হয়ে আসতে চায়। পৃথিবীর আলো-বাতাস গায়ে মাখতে চায়, পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়ে উঠতে চায়। তখন সেই ছোট্ট প্রাণকে মুক্ত করার জন্য মা পাখিকেও খোলসের উপর ঠোঁকর মারতে হয়। তা যদি না করে ছোট্ট দুর্বল শিশুটি মুক্ত হতে পারবে না।

ইংরেজ থেকে গেলে আজ যারা নেতা-মন্ত্রী তারা তা হতে পারত না। আজ যেসব নেতা-মন্ত্রী লক্ষ-কোটির উপর দৌড়েছে তারা তা পেতে উঠত না। তাদের বিরাট ক্ষতি হতো। বলা হয় ইংরেজরা এদেশকে দোহন করে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা তাদের দেশে নিয়ে গেছে। এদেশের নেতারা যে টাকার পাহাড় নিয়ে জমা করেছে সেই ব্যাঙ্কগুলো কী স্বদেশী? বলা হয় ইংরেজ টন টন সোনা নিয়ে গেছে। ও দিয়ে কী হর? চাষীর লাঙলের ফলা হবে না, মজুরের হাতুড়ি হবে না, মায়ের রান্না হাড়ি-কড়াই হবে না অথচ দশগ্রামের দাম তিরিশ হাজার। আমার তা কোন কাজের?

কী করে হয়েছে, কেন হয়েছে, আমার পক্ষে বলা একটু কঠিন। তবে এটা ঠিক যে সমাজে যে কোন বস্তুর দু-রকমের মূল্যমান নির্ধারণ করা হয়েছে। একটা ব্যবহারিক মূল্যমান, অন্যটা আরোপিত। অনেক কৌশলি প্রচারে বস্তুর যথার্থ মূল্যমানকে হারিয়ে দেয় আরোপিত মূল্য। একশ গ্রাম সরষের তেল- যা ভাজাভুজি রান্নায় লাগে- দাম বড়জোর দশ টাকা। এটাকেই জাপান থেকে আনা অমুক রোগের অব্যর্থ তেল বলে প্রচারে একশ টাকা হয়ে যাবে। একটি আদিবাসি ছেলে নিচে থেকে তীর চালিয়ে কাঠবেড়ালিকে পেড়ে ফেলেছে তার কোনও দাম নেই। একজন একটা কাঠের তক্তা দিয়ে একটা বল মাঠের বাইরে ফেলতে পেরেছে তার দাম এক লক্ষ।

এই আরোপিত মূল্যমানের উপর দাঁড়িয়ে বামুন সম্প্রদায় নামমাত্র শ্রমের বিনিময়ে হাতিয়ে নিয়ে যায় অনেক-অনেক বেশি পারিশ্রমিক। তাকে যে ডেকে নিয়ে এলাম। না

আনলে কী হয়? সে যে খানিকক্ষণ অংক বং আউড়ে গেল, না আওড়ালে বা কী হতো?

কথায় কথায় মূল বিষয় থেকে সরে এসেছি। বলছিলাম ইংরেজ শাসনের কথা। ইংরেজ থাকলে কী হতো, না থাকলে বা কী হয়েছে। ওরা থাকলে জালিয়ানওয়ালাবাগ, এরা থাকলে মরিচকাপি। ওরা জেলে ঢোকায় সূর্য সেনকে, এরা ঢোকায় বিনায়ক সেনকে। ওরা গুলি করে মারে মাতঙ্গিনী হাজরাকে এরা মারে শংকর গুহ নিয়োগীকে। ওরা বলত ক্ষুদীরাম-ভগত সিং-মাস্টারদা সঙ্গ্রাসবাদী, এরা বলে সন্ন্যাস দত্ত-চারু মজুমদার-কিৎসেজি তাই। সবকিছু আছে আগেরই মতো, কিছুই বদলায় নি।

সে উন্নয়ন ধমকে গেছে, খুঁড়িয়ে চলছে, মেরে ফেলার চেষ্টা শুরু হয়েছে পুনরায় বর্ণপ্রভুদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর থেকে। মহারাষ্ট্রের দলিতদের নেতা ভীমরাও রামজি আবেদকর সংবিধান সভায় প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। বর্ণপ্রভু এক নেতা বাবাসাহেবকে ভোটের হারিয়ে দেবার পর উল্লাসে ফেটে পড়েছিলেন। বলেছিলেন সংবিধান সভার দরজা তো দূর কী বাত আবেদকরকে নিয়ে হামলোগোনে খিড়কি তক বন্ধ কর দিয়া। তাদের সেই কুচক্রান্ত বুঝতে পেরে নমঃশূদ্রদের নেতা যোগেন মন্ডল ওঁনাকে পূর্ববাংলায় ডেকে এনে ভোটের দাঁড় করিয়ে নিবাচিত করে সংবিধান সভায় প্রবেশ করিয়ে বর্ণবাদী নেতাদের মুখের মতো জবাব দেন। তারই ফলে কিছুটা হলেও দলিত মানুষ নিজেদের প্রাপ্য অধিকার রক্ষা করতে পারছে।

বাবাসাহেব চেয়েছিলেন দলিত মানুষ শিক্ষিত হোক, সচেতন হোক, সংগঠিত হোক। শিক্ষিত তারা হয়েছে বটে কিন্তু সে শিক্ষাকে মোটেই সুশিক্ষা বলা চলে না। যে শিক্ষা নিজেকে উচ্চ আর অন্য সবাইকে হীন ভাবতে শেখায়, যে শিক্ষা চাকুরি অর্থাৎ শুধুমাত্র চাকরবৃত্তি করতে শেখায়, যে শিক্ষা আত্মসম্মানবোধ শেখায় না, চটুকুরিতা বা যে কোনও ঘৃণ্য পথ পদ্ধতির মাধ্যমে আরও আরও সুখ-সম্পদের পিছনে খাবিত করে সে শিক্ষা মোটেই সুশিক্ষা নয়।

দলিত সমাজের একশোর মধ্যে নিরানব্বই কিংবা তার চেয়েও বেশি শিক্ষিত ওই পথের পথিক। সে তার শিক্ষাকে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ ছাড়া সমাজের কোনও হিতে খরচ করতে নারাজ। এই সমাজে বহু বিদ্বান আছে, পণ্ডিত আছে, বুদ্ধিজীবী আছে, কোটিপতি আছে কিন্তু একজনও বিনায়ক সেন-শংকর গুহনিয়োগী নেই।

বাবাসাহেব জানতেন না যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে শিক্ষিত করে কিন্তু প্রকৃত মানুষ করে না। দরদী করে না, মানবিক করে না। তাই শেষ বয়সে আক্ষেপ করে বলতে হয়েছিল — এইসব শিক্ষিত মানুষরা আমাকে ঠকিয়েছে সবচেয়ে বেশি।

এই শিক্ষাব্যবস্থায় এই-ই হয়, এই-ই হবে। এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না। যে কারণে এক পাগল ব্যথিত হয়ে বলেছিলেন — এই শিক্ষা ব্যবস্থায় যে যত পড়ে সে তত মূর্খ হয়। এই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল — যারা অন্যদের চেয়ে মস্তিষ্ক চালানায় একটু বেশি দক্ষ চাইলে সমাজকে নেতৃত্ব দিতে পারে, তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ঢাগিয়ে দিয়ে, আত্মসুখ সর্বস্ব করে তুলে সাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দাও।

আমি বেশ কিছুকাল ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলায় ছিলাম। ওখানকার ভানপুরি নামে এক গ্রামে এক শিক্ষক থাকেন। তিনি আদিবাসী। পুরো গ্রামটাও তাই-গোন্ড জাতির মানুষের বসবাস। শিক্ষক লোকটি শিক্ষিত হবার কারণে -অপশিক্ষার প্রভাবে-যাদের সাথে একবাক্যে খেলেছেন-খেয়েছেন-মেলা দেখতে গেছেন তাদের ঘৃণা করতে শেখেন। স্বপোত্র স্বশ্রেণীর বদলে থাকেন অ-আদিবাসী উচ্চশ্রেণীর সাথে। এর ফলে ধীরে ধীরে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে যান জনজাতি-সমাজ জীবন থেকে। একা হয়ে যান।

তিনি যতই উচ্চবর্ণ উচ্চশ্রেণীর মানুষকে স্বশ্রেণী-স্বপোত্রের মনে করন না কেন তারা একে আদিবাসী ছাড়া অন্য কোনও সম্মান দিতে রাজি নয়। দলিত বা আদিবাসী সমাজের যে কেউ যত উঁচুতেই উঠুক, উচ্চবর্ণের লোকেরা কোনওদিনই সমকক্ষ-সমমর্যাদার বলে স্বীকার করে না। সারাজীবন উচ্চবর্ণের পদসেবা করে শেষ বয়সে জগজীবন রাম কী লাখিটা খেয়েছিল সেটা সবাই জানে। ছিটকে পড়েছিল প্রধানমন্ত্রীর চেয়ার থেকে শত মাইল দূরে। যোগ্যতার হিসাবে যা তারই পাবার কথা।

তবে আমাদের দলিতদের চিন্তা-চেতনার চামড়া খুব মোটা। শিক্ষার সাথে সাথে সে চামড়া ক্রমে পুরু হয়। লাখি-ফাতিতে খুব একটা অপমান হয় না। মার, কত মারবি, এক থালা পাত্তার সাথে দুটো কাঁচালঙ্কা দিস তাহলেই হবে। তাই সেই জগজীবন তনয়া বাপের শেষ করা জায়গা থেকে শুরু করেছে বর্ণপ্রভুদের পদসেবন। আর একটা লাখি পড়ার আগে পর্যন্ত সেবা চলবে।

লাখি সেই শিক্ষকের কপালেও পড়ল। তার ক্লাস নাইনে পড়া মেয়ে আসছিল স্কুল থেকে। জঙ্গলে একা পেয়ে ধর্ষণ করে দিল বর্ণপ্রভুদের তিনজন। শিক্ষক তখন ছুটে গিয়েছিল উচ্চবর্ণের প্রভাবশালী লোকদের দরজায়। বিচার করো। বিচার পায়নি। মেয়ে আমাদের কাছে এসেছিল। আমরা গিয়েছিলাম তাদের গ্রামে। গ্রামের মানুষকে বলেছিলাম এটা আদিবাসী মর্যাদার প্রশ্ন। চলো থানা ধরোও করব। তারা জবাব দিয়েছিল — বাবুলোগোন কে সাথে বাবুলোগোন কা করিন, হামন কা জানন! অর্থাৎ এটা একান্তই বাবুদের ব্যাপার, আমাদের নয়।

এই বিভাজন পশ্চিমবঙ্গের দলিত সমাজেও ঘটে গেছে। একদল শিক্ষিত সাজ্জল ক্ষমতাবান আর একদল নুন আনতে পাঠা ফুরোষ। সেই হা-অন্ন মানুষের দুই দলের কারও সাথে কারও কোনও যোগসূত্র নেই। প্রথম দলের নেই জনবল। দ্বিতীয় দলের নেই ধনবল। যদি পারস্পরিক সংযোগ-সহযোগিতা থাকত একটা শক্তিশালী দলিত সংগঠন গড়ে উঠতে পারত। তা হয়নি তাই বাবাসাহেবের বালী - সংগঠিত হও, সেটাও মাঠে মারা গেছে। সারা ভারতবর্ষের এই একই অবস্থা। এরপরই অন্তর্জালি যাত্রা।

মায়াবতী একা নয়। সে একটা উঁচু জায়গায় বসে আছে বলে তার মাথাটা দূর থেকে দেখা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে দলিত শ্রেণীর মানুষের সবচেয়ে বড় সংগঠন মতুয়া মহাসংঘ। হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের বংশধররা যার সর্বময় কর্তা। যে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ বেদ বিদ্রোহী, ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী ধর্মমত মতুয়া ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, কালের কী নির্মম পরিহাস — সেই ঠাকুর পরিবারের লোকেরা আজ কেউ ভট্টচার্য কেউ বন্দ্যোপাধ্যায় বামুনের পায়ে কিছু প্রাপ্তির আশায় প্রণত হচ্ছে। স্বজাতির লোকদের নিয়ে শক্তিশালী গণ আন্দোলন গড়ে চাপ দিয়ে সরকারের কাছ থেকে ন্যায্য অধিকার আদায় করার পথে হাঁটছে না। আবেদন-নিবেদন-তোষামোদ-চট্টাকরিতা-স্বাবকতা এই দিয়ে ভরে তুলছে প্রাপ্তিসুখের ডাঁড়ার।

আজ থেকে কুড়ি-বাইশ বছরে আগে দিল্লীতে একটা সম্মান প্রদানের অনুষ্ঠান করেছিল তৎকালীন সরকার। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বহু মানুষের আমন্ত্রণ ছিল সেখানে। একটা করে মানপত্র আর পঁচাত্তর হাজার করে টাকা দেওয়া হচ্ছিল প্রত্যেককে। সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন অভিনেত্রী শাবানা আজমি। এক সময় তাঁর ডাক এল। তিনি মাঝে উঠলেন। মাথায় একরাশ খোলা কালো চুল, কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি। চারদিকে শত শত রঙিন বৈদ্যুতিক আলো। রূপ আর প্রতিভার অপূর্ব মেলবন্ধন। টিভির পর্দায় আমি সে দৃশ্য দেখছি। আমার সাথে সাথে সারা পৃথিবী দেখছে। মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন শাবানা। তারপর? স্তম্ভিত হয়ে গেল সারা বিশ্ব তার অকপট সাহসী উচ্চারণে — আমি এই খুনি সরকারের দেওয়া সম্মান প্রত্যাখ্যান করছি। যে সরকার সফদার হাসমির মতো নাট্যকর্মীকে হত্যা করেছে, সেই রক্তমাখা হাতের পুরস্কার নেবার কোনও অধিকার নেই আমার। এই বলে মঞ্চ থেকে নেমে চলে গেলেন।

গত বছর চৌত্রিশ বছর বঙ্গ শাসনের পর বিদায় নেবার প্রাকমুহুর্তে বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের নামে একটা পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। আর অন্য অপর কেউ নয় সেই পুরস্কারটি দিতে বাছাই করে সেই ঠাকুর পরিবারের একজনকে। আশা

করেছিলাম, বড় আশা করেছিলাম সে মঞ্চে উঠবে আর বলবে — মরিচকাপির জেলে-মালো-পোদ-নমঃশূদ্রদের যারা খুন করেছে সেই খুনিদের হাত থেকে পুরস্কার নেব না। মাত্র তো পঁচিশ হাজার। যারা প্রতি বছর পায়ের ধুলো বেচে লাখ লাখ টাকা কামায় এইটুকু লোভলালসা তারা নিশ্চয় ত্যাগ করবে। আমার আশা পূর্ণ হল না। হাত বাড়িয়ে সে টাকা কটা নিয়ে নিল। আমি মতুয়া নই। কোনওদিন হব না। আমার বাবা ছিলেন মতুয়া। মতুয়া বাপের ছেলে বলে, ঠাকুরবাড়ির লোকের এমন উলঙ্গ উজ্জ্বলি দেখে ফোভে ঘৃণায় মরে গেলাম আমি সেদিন লোকচক্ষুর আড়ালে।

দলিতদের নেতাদের বিশ্বের আর কোনও ব্যাপারে বিশেষ মাথা ব্যাথা না থাকুক একটা ব্যাপারে কিন্তু বেশ সরব — সেটি সংরক্ষণ। সরকারি চাকুরিতে সংরক্ষণ। যে কোনও সভা-সমিতি-সেমিনারে-বক্তার বক্তৃতায়-কোনও দলিত পত্রিকায় প্রবন্ধের পাতায় এই বিষয়টা বারবার ঘুরেফিরে আসে। চেতনালহর পত্রিকার তো ঘোষিত অবস্থান সংরক্ষণের পক্ষে। ‘অবহেলা যতদিন সংরক্ষণ ততদিন’। পত্রিকা সম্পাদক জাতবামুন হয়ে যখন সংরক্ষণের পক্ষে দলিত হয়ে আমি তার বিরোধিতা করব! পাগল নাকি! তবে কী না, আমার দুইখান কথা আছে —

প্রথম কথা হচ্ছে রাষ্ট্র কী?

‘এক দাড়িওয়ালা বুড়ো বলছে রাষ্ট্র হচ্ছে এক শ্রেণী দ্বারা আর এক শ্রেণীকে দমিয়ে রাখার যন্ত্র।’

কথাটাকে খুব একটা মিথ্যা বলে মনে হয় না। দেশের মোট রাজস্বের যাট শতাংশ ব্যয় করে মিলিটারি বাহিনী পুষতে হয়, মারণাস্ত্র কিনতে বা বানাতে হয়। যদি তা না করা হয়? যদি সব দেশের সব সীমান্ত খুলে দেওয়া হয় তাতে আমার মতো গরিব লোকের কী লোকসান? ওইদিক থেকে একদল লোক নিয়ে এলো ভেড়ার লোমের কম্বল। সেটা দিয়ে এদিক থেকে নিয়ে গেল আধ বস্তা চিনি। আমি ওদিকে নিয়ে গেলাম দুটো গরু, নিয়ে এলাম এক বুড়ি ইলিশ। এতে এই বিশ্বের কী কিছু ওলটপালট হবে? হবে না! তাহলে ওই সীমান্ত-কাঁটাতার-গুলিবাক্স-হস্তিহা কার জন্য? কার স্বার্থের রক্ষায়? তার নয়, আমার নয়, আপনার নয়। তাহলে এই অদৃশ্যটি কে?

কোনও গরিব মানুষের দেশ-প্রদেশ-মহাদেশ থাকে না। তার পেট আর পেটের ক্ষিধে সেটাই তার সবকিছু। যেখানে সে একটা সম্মানজনক জীবন-জীবিকা পেয়ে যাবে সেখানকার মাটি-মানুষকেই আপন বানিয়ে নেবে। বিশ্বাস না হয় চলে যান দণ্ডকারণা। গিয়ে সেখানকার মানুষকে বলুন যে মরিচকাপির জন্য তোমরা এত মার খেয়েচিলে

আজ তার চেয়ে ভালো ভূমি-বাসস্থান দেখো, বাংলায় চলো। দেখবেন একজনও আসবে না। দণ্ডকারণের কঠিন মাটিতে তারা এখন শেকড় চারিয়ে দিতে পেরেছে। খুঁজে নিতে শিখে নিয়েছে বেঁচে থাকার রসদ। সেসব ফেলে আর অচেনা ভূগোল অচেনা দেশ অচেনা মানুষের কাছে বাংলায় আসবে না। আসবে তখন যখন সেখানে জীবন এবং সম্মানের উপর আঘাত আসবে, পেটের অম্ল টান ধরবে। সেদিন সে বাংলা কেন বেলেচিষ্টানেও যেতে রাজি হয়ে যাবে।

এই অভাবী মানুষ যেন এখার থেকে ওখার, ওখার থেকে এখারে চলে না যেতে পারে তারই জন্য কঁটাতার-পাহারা-গুলি-বন্দুক। মানুষ তো শুধু মানুষ নয়, সে একটা বাজার, সে একটা উৎপাদনক্ষম যন্ত্র। তাদের ব্যবহার করেই তো দু-দশজন সম্পদশালী হয়। এই দু-দশজন সম্পদশালী নিজেদের সুবিধার্থে পৃথিবীটাকে ভাগ করে নিয়েছে। ওদিকটার যত ফসলের ক্ষেত-বনিজ পদার্থ-জল-অরণ্য-মানুষ-পশু সব তোমার। আমি যাব না দখল করতে। এদিকে যা কিছু সব আমার, তুমি আসবে না। যদি আসো আকাশে বোমারু বিমান, নিচে কামান চলবে।

এই খণ্ডিত ভূমণ্ডলের কঁটাতার ঘেরা সীমানার নাম রাষ্ট্র। আর সেই সীমার মধ্যে বসবাসকারী মানুষকে শাসন-শোষণ-দোহন-দমন এই সবই রাষ্ট্রের কাজ। রাষ্ট্র তার এই ব্যবস্থাকে সূচারু রূপে সঞ্চালিত রাখার প্রয়োজনে অনেক বাহুর নির্মাণ করে, শক্তিশালী করে। বিশাল এই শাসন-শোষণ ব্যবস্থা গোটাকয়েক লোক দ্বারা তো চালানো যায় না। প্রচুর বাধ্য-বিনীত-অনুগত সহযোগী লাগে। এই সহযোগীর একদল সরকারি কর্মচারি, সামরিক-আধা সামরিক বাহিনী, পুলিশ কিংবা দণ্ডরে বসে কলম ঘষা করেনী। মোদ্দা কথা একেবারে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি থেকে পঞ্চায়েতের চাপরাসি - জ্ঞানে বা অজ্ঞানে তাদের সেই শোষণ ব্যবস্থার অঙ্গ হতে হয়েছে। রাষ্ট্রের এই শোষণযন্ত্রের যঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে যে কোটি কোটি মানুষ— শ্রমিক-কৃষক তাদের জাতিগত পরিচয় কী? হয় দলিত নয় আদিবাসী না হয় সংখ্যালঘু মুসলিম অথবা ও.বি.সি। তাদেরই শ্রম এবং ঘামের দাম আত্মসাৎ করে ফলে ফেঁপে উঠছে রাষ্ট্র তথা তাকে আবর্তন করে থাকা কিছু ব্যক্তি। এই শোষণ-দোহন-লুণ্ঠ-দখল করে নেওয়া অর্থের কিছুটা তারা ফিরিয়ে দেয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন, পেনশন, গ্র্যাচুইটি, ডি.এ., টি.এ. ইত্যাদির মাধ্যমে। যে মালিক কুকুর পোষে, বাড়ির কিরের ছেলেকটার অসুখে ওষুধ না কিনে দিক বাজার থেকে পাঠার ঠ্যাং কিন্তু নিয়মিত আসবে।

তাহলে এখন যে দলিত শিক্ষিত মানুষদের পক্ষ থেকে প্রবল সংরক্ষণের দাবি উঠছে প্রকারান্তরে তার অর্থ কী দাঁড়াচ্ছে? হে মহান রাষ্ট্র, তুমি যে আমাদের দলিত-আদিবাসি-

ও.বি.সি.-সংখ্যালঘু ভাইদের ঘাম রক্ত চোখের জল সব একলা চেটেপুটে খাচ্ছে, একা খেওনা, আমাদেরও একটু ভাগ দাও। আমাদেরও কিছু শোককে ওই শোষণ আর শাসন যন্ত্রের নাটকশটু বানিয়ে দাও। এছাড়া আর অন্য কী মানে-আমার জানা নেই।

প্রথমতঃ আমাদের এই দলিত সমাজের শতকরা নিরানব্বই জন মানুষই নিরক্ষর। পেটে ভাত পরনে জামা নেই বিদ্যালভ করবে কী করে? যদি শতকরা একশো ভাগ চাকরিও দলিতদের জন্য সংরক্ষিত করে রাখা হয় তাদের কোনও উপকার হবার নয়। সে চাকরি পাবে তারাই যারা শিক্ষিত এবং সচ্ছল। যারা আগেও পেয়েছে। আর সেই নির্ধন নিরক্ষর যে আগে কোনও বামুন-কায়েত-বদ্যির বাসন মাজত, চাকর খাটত এখন কোনও দলিত বাবুর বাসন মাজবে, চাকর খাটবে। এতে ব্যক্তিবিশেষ লাভবান হলেও সামগ্রিকভাবে দলিত সমাজের কী লাভ?

আগে বামুন-কায়েত-বদ্যি বাবুদের বাড়ি-গাড়ি-টাকার পাহাড় হত। এখন যদি কিছু দলিত বাবুদের তা হয় হোক না। তবে সেটা হওয়া দরকার তার মেধা-মনন-যোগ্যতায়। সমাজটাকে সিঁড়ির মতো ব্যবহার করে নয়। 'যোগ্যতা' এই শব্দটা নিয়েও আজকাল বিতর্ক আছে। পাঁচ-ছয়জন প্রতিবন্ধী গিয়েছিল একটা চাকরির জন্য। চাকরিটি প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। যার যোগ্যতা বেশি সে পেলনা, পেল সে যার ঘুষ দেবার ক্ষমতা ছিল। এক্ষেত্রে ঘুষ দিতে পারাটাই আসল যোগ্যতা। এটা সর্বত্র হচ্ছে। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি দলিতদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলোও এই শ্রেণিতে রাখছি। খবর পাচ্ছি লালগড়ে আদিবাসী ছেলেদের পুলিশ কনস্টেবলের চাকরিতেও নাকি এই প্রথা চালু হচ্ছে।

ফলে সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। থাকে ভালো, না থাকলে আরো ভালো। যদি ওই ব্যবস্থার মাধ্যমে চাকরি পাওয়া দলিত বাবুটি আয়ের কিছু অংশ সমাজের কাজে ব্যয় করতেন অবশ্যই আমি পক্ষে থাকতাম। ওরা সেটা করবে? আমার মা আগে উচ্চবর্ণের বাবুদের বাসন মাজত। এখন আমার মেয়ে যদি কোনও দলিত বাবুর বাসন মাজে তাতে আমার পুলকিত হবার কিছু নেই।

Good Wishes from :-

SYMAD

**Student
Youth
Movement
Against
Discrimination**

ভারত — কার উন্নয়ন? কোথায় উন্নয়ন?

কোবাত গান্ধী

ভাষান্তর : অর্ক সেনগুপ্ত

উন্নয়নের রূপরেখা

একটা দেশ কাদের নিয়ে তৈরি হয়? মূলত দেশ তৈরি হয় জমি ও জনগণ নিয়ে। ১৩০ কোটি জনগণের দেশ ভারত। সেখানে জনগণ ও জমির উন্নয়নই হল দেশের উন্নয়ন। জনগণ ও জমির উন্নয়নকে অবহেলা করে যে উন্নয়নই হোক, তা দেশের পশ্চাদগামীতা। জনগণ ও জমির মধ্যে অবশ্যই জনগণই প্রধান, কিন্তু জনগণের উন্নয়নও কোনোভাবেই প্রকৃতির ক্ষতিসাধনের মূল্যে করা উচিত নয়। জনগণ ও জমি তথা প্রকৃতির উন্নয়নের মধ্যে এক আন্তঃসম্পর্কের রূপরেখা অবশ্যই স্থাপন করা উচিত।

আমি যখন জনগণের কথা বলছি তখন ভারতের এই সুবিপুল জনসমুদ্রের কথাই বলতে চেয়েছি আমি। আমরা উন্নয়ন বলতে অল্প কিছু মানুষের আরো ভালো থাকা নয় বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ বহুজন জনতার উন্নয়ন বুঝি। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ বহুজনই হলেন আমার ভারত, তাদের উন্নয়নই ভারতের উন্নয়ন।

আর আমি জমি বলতে বোঝাতে চেয়েছি এক ব্যাপক সংজ্ঞা যার মধ্যে যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদই পড়ে — খনিজ, জমি ও তার উর্বরতা, জঙ্গল, জল, বাতাস ইত্যাদি। এককথায় প্রকৃতি।

জনসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদই হল দেশ। এটাই ছিল বহুদিনের ভাবনা। জিডিপি বা হাইটেক উন্নয়নের ধারণাগুলি যে উন্নয়নের মডেলকে সামনে আনছে তার বহু আগে থেকেই এই ভাবনাকে পাওয়া যায়। এমনকি বেঙ্গল ও এরই উল্লেখ আছে—

আমাদের মাতৃভূমি

যে পৃথিবীর রানী

যে নিজের বুকে বহন করছে
পবিত্র আশ্রন ও নিখাদ সোনা,
যিনি নিরাপত্তা দিচ্ছেন সবাইকে
যে নিরাপত্তা নিশ্চিত,
এবং সমস্ত সজীবকে আশ্রয় দিচ্ছেন
নিজের কোলে

অথর্ব বেদ - ১২.১.৬.

এখন আমি যখন জনসম্পদের উন্নয়নের কথা বলি, তখন আমি নিছক অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বলি না, বরং আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের কথা বলতে চাই। অবশ্যই মানুষের তার জীবনের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাবার, জল, কাপড়, বাসস্থান, জীবিকা, চিকিৎসা, ও শিক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু সেটা মানুষের ব্যক্তিগত বিকাশের সূচনা কিন্তু মাত্র। জল, জানোয়াররাও খাদ্য ও জল পায় (এটাই দুর্ভাগ্যজনক যে আমরা নিজেদের জীবন জন্ত জানোয়ারের চেয়েও কম ও খারাপ আবর্তে কাটাচ্ছি)। কিন্তু একমাত্র প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের দ্বার, যা তাদের আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে আসতে পারে, তা দিয়েই আমরা আমাদের দেশের জনসম্পদের প্রকৃত উন্নয়ন ঘটাতে পারব।

এবং এখানে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন, যে আধ্যাত্মিকতা বলতে আমি এখানে ধর্মের কথা বলিনি, বলেছি কিছু মূল্যবোধের কথা যা দাঁড়িয়ে আছে মানুষের সাথে মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা, মর্যাদার ওপর। কোনো উচু-নিচু ভাবনা, প্রভুত্ব, জোর করা বা বর্ণবাদের ওপর নয়।

জনগণকে এগোতে দেওয়া দরকার এবং এগোতে দেওয়া দরকার প্রকৃত স্বাধীনতার খোলা বাতাসে। বসন্তকালের ফুলের মতো তার ফুটে ওঠা দরকার। কিন্তু এই উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন জনগণ বৈষম্য, ক্ষুধা ও অমর্যাদাকে ধ্বংস করবে। একজন ক্ষুধার্ত, রোগগ্রস্ত, আত্মমর্যাদা কি না জানা মানুষ শুধুই ভাবতে পারেন তার পেট কিভাবে ভরবে

তাই নিয়ে। যখন মানুষকে তার ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি মেটানোর ব্যাপারে দৃষ্টিভ্রান্ত থাকতে হয় না, শুধু তখনই সে নিজের আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক এরকম নানা বিষয়ে উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দিতে পারে। বাইবেল-এ লেখা আছে — ‘মানুষ শুধু রুটির জন্য বাঁচে না, কিন্তু রুটিই তার মানবিক উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করে’।

তাই, এই উন্নয়নের রূপরেখায় সংখ্যাগরিষ্ঠ বহুজনের উন্নয়নই দেশের উন্নয়ন।

উন্নয়নের দ্বিতীয় এবং প্রথম বিষয়টির (জনগণ) সাথে সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ দেশের জমি, জল, জঙ্গল, খনিজ ও যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ। এগুলির উন্নয়ন সেই রূপরেখাতেই হওয়া দরকার যাতে এগুলি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বহুজন জনগণের স্বার্থের সেবা করতে পারে। উন্নয়নের এই ভাবনা নিয়ে এবার জানা যাক সেই বাধা ও অপচেষ্টাগুলিকে, যেগুলো আমাদের দেশের সামনে আজ দাঁড়িয়ে আছে।

যে বাধার পাহাড় গুলিকে টপকাতে হবে

বাজেট অধিবেশনের দিন সন্ধ্যায় পেশ হওয়া সরকারের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৯-১০ খুবই সঠিকভাবে বলছে — “একটি জাতি আগ্রহী হয় আভ্যন্তরীণ বৃদ্ধিতে, দেখে সেই বৃদ্ধির ভিত্তি একটি ছোট অংশে; র হাতে প্রাথমিকভাবে স্থাপিত, নাকি সমগ্র জনসমষ্টির মধ্যে বন্টিত। পরেরটি উৎসবের দাবী করে, প্রথমটি নয়। অন্যভাবে বলতে গেলে বৃদ্ধি যেন নিজের পরিসংখ্যানেই না শেষ হয়ে যায়, বরং সবার জন্য সমৃদ্ধি নিয়ে আসার উপকরণ হয়ে ওঠে”।

এরপর এই সমীক্ষা দেখিয়েছে কিভাবে এই আভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি ঘটছে মানুষ প্রতি জিডিপি (গড় আভ্যন্তরীণ উৎপাদন) ও মানুষ প্রতি ক্রয় ক্ষমতায়। কিন্তু এই গড় জন প্রতি হিসেব দেশের আসল চিত্র তুলে ধরে না। কারণ এই পরিসংখ্যান সংখ্যাগরিষ্ঠ, গরিব বহুজনের সাথে কোটিপতিদেরকেও একই সারিতে বসিয়ে গড়টা করেছে।

বাস্তবটা একদমই আলাদা। প্রতিটি দেশের এক ভয়াবহ ছবিকে সামনে আনছে যা সরকার ও মিডিয়ার তৈরি করা ক্যানভাস টার থেকে বিপরীত, বিশাল জিডিপি-র বৃদ্ধি, আকাশ ছোঁয়া শেয়ার মার্কেট সূচক ও বিদেশী বিনিয়োগকেই উন্নয়ন বলে দেখানোর

চেষ্টা সেখানে ব্যর্থ হয়ে যায়।

প্রথমে আমি কিছু তথ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইব, তারপর বাস্তব চিত্রের দিকে আসব। আসলে প্রতিটি তুলনামূলক সমীক্ষাই ভারতকে দাঁড় করায় সাহারা-আফ্রিকার দেশগুলির চেয়েও খারাপ অবস্থায় যেটা কিনা পৃথিবীর সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া দেশ।

ভারত ১৩৪ (মোটামুটি ১৮০) দেশের মধ্যে) জাতিপুঞ্জের মানব উন্নয়ন সূচকে, লাওস, ভুটানের মতো দেশগুলির পেছনে। ১৯৯৪ সালেও ভারত এই ১৩৪ নম্বরেই ছিল। এই তথ্যে কিন্তু ভারতের কোনো উন্নয়নই হয়নি। বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসাবে ছবিটা আরও করুণ। জনপ্রতি গড় জাতীয় উৎপাদনে ভারত ১৪ নম্বরে। মজার কথা হল, এরপরও ভারতের রাষ্ট্রপতি লাওস গিয়ে ১৫ মিলিয়ন ডলার লাওসকে ঋণ দেওয়ার কথা বলে এসেছেন (১০ কোটি = মিলিয়ন। ১ ডলার = মোটামুটি ৫৫ টাকা)

আন্তর্জাতিক ক্ষুধাসূচকে ভারত ৬ নম্বরে ৮৮ টা দেশের মধ্যে। বৈষম্য সূচকে ছবিটা ফুটে ওঠে আরও করুণভাবে, যেখানে বৈষম্যকে আর, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদির নিরিখে দেখা হয়, সেখানে দেখা যাচ্ছে ভারতের ৬৫ কোটি মানুষ নিদারুণভাবে দরিদ্র (শুধু দরিদ্র নয়, নিদারুণভাবে দরিদ্র) যা মোট জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ। ভারতের আটটি রাজ্য (বিহার, ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ) পৃথিবীর সবচেয়ে গরিব ২৬ টি দেশের জনসংখ্যার থেকেও বেশি নিদারুণভাবে দারিদ্রপীড়িত নাগরিকদের ধারণ করছে।

এটাই সব নয়। শিশু, মহিলা ও বয়স্কদের অবস্থাটা আমাদের দেশে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ বললেও কম বলা হবে। ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী, ৫ বছর বয়স অবধি অপুষ্টির শিকার শিশুদের তালিকায় ভারত শুধু ইথিওপিয়ায় চেয়ে ভাল অবস্থায় আছে। ইথিওপিয়ায় অপুষ্টির শিকার শিশুদের অনুপাত ৫১ শতাংশ, ভারত ৪৮, কঙ্গো ৪৬, তানজানিয়া ৪৩, বাংলাদেশ ৪২, পাকিস্তান ৪, নাইজেরিয়া ৩৭, ইন্দোনেশিয়া ৩৭, চীন ১৫। পৃথিবীর অর্ধেক অপুষ্টির শিকার শিশু ভারতে বাস করে। ভারতের মোট শিশুর প্রায় অর্ধেক অপুষ্টির শিকার।

খাদ্যের অধিকার প্রচার উদ্যোগের সীমিত অনুযায়ী দুই-তৃতীয়াংশ মহিলা খাদ্যের অভাবে রক্তাক্ত হয়ে ভুগছেন, এক-তৃতীয়াংশ গ্রামীণ প্রাপ্তবয়স্করা স্বাভাবিকের থেকে শরীরের ওজন কম ধরেন এবং সার্বিক অপুষ্টির হার ভারত বেশ কিছু আফ্রিকার দেশকেও পেছনে

ফেলে দিয়েছে। (দুনিয়ার সবচেয়ে পশ্চাদপদ অঞ্চল।)

যদি এখানেই দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, তবে ধরে রাখুন আরও বাকি আছে। কিছুদিন আগে তৈরি হওয়া মৃত্যু সূচকে আরও ভয়ানক খবর পাওয়া যাচ্ছে। এই সূচক মৃত্যুর কারণ, বয়স, মৃত্যুর আগে বয়স্কদের পাওয়া চিকিৎসা সংক্রান্ত সমীক্ষা। ভারতের তথাকথিত স্বাধীনতার পর যে দেশগুলি সেই স্বীকৃতি পেয়েছে তারও এই সূচকে ভারতকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। এমনকি থিওপডাবেও। তাই সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ বহুজন মানুষরা তথাকথিত স্বাধীনতার ৬৫ বছর পরেও সামান্যতম উন্নতির মুখ দেখেনি, উন্ট বৃটিশদের প্রত্যক্ষ শাসনের থেকেও খারাপ অবস্থায় গিয়ে পড়েছে।

এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের জাতীয় কমিশন দ্বারা করা দুটি সমীক্ষা যে বাস্তবতা তুলে আনছে তা একই সাথে লজ্জাজনক ও আশঙ্কাজনক। এতে বলা হয়েছে ভারতের ৭৫ শতাংশ মানুষ চরমভাবে বৈষম্যপীড়িত এবং ৭৭ শতাংশ মানুষ (৮৩.৬ কোটি মানুষ) দিনে ২০ চাকার চেয়েও কম টাকায় বেঁচে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। যখন খাদ্যব্যয়ের মূল্য বৃদ্ধি ২০ শতাংশ হারে এগোচ্ছে। আরও দেখা যাচ্ছে গ্রামীণ জনগণের ৭৭ শতাংশ মানুষ তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ক্যালোরী (জনপ্রতি ২৪০০) ওপেতে অক্ষম খাদ্যের মাধ্যমে। ১৯৯৩ সালে ৬৯ শতাংশ ছিল এর পরিমাণ।

আরেকটি নিক থেকে দেখলে খাদ্যব্যয় গ্রহণে ভারতে ১৯৯১ সালে ছিল ১৯৯ কেজি প্রতি জন। ১৯৯৮ সালে সেটা হয়ে দাঁড়ায় ১৫১ কেজি, যেখানে ১৮২ কেজি হচ্ছে গড় অনুন্নত বা সবচেয়ে কম উন্নত দেশগুলিতে, ১৯৬ কেজি আফ্রিকার দেশগুলিতে, আন্তর্জাতিক গড় হলে ৩১৫ কেজি। ভারত আন্তর্জাতিক গড়ের অর্ধেক রাত্তায় দাঁড়িয়ে আছে এবং সবচেয়ে গরিব দেশগুলোর চেয়েও নীচে অবস্থান করে চোঁচাচ্ছে, “ইন্ডিয়া সাইনিং”।

১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে ২ লাখ কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতা কতটা রুঢ় এর থেকেই বোঝা যায়। সরকারের নীতি যা কৃষিক্ষেত্রের থেকে যাবতীয় মুনাফা, শুধে নিতে চাইছে তারই ফলশ্রুতিতে এই কাজ, বীজ, সার, কীটনাশক প্রস্তুতকারক বড় কোম্পানীগুলোর দ্বারা। মহারাষ্ট্রে যেখানে আত্মহত্যার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ‘৯৭-’০২ সালে দিনে আত্মহত্যা ছিল ৮টি, ‘০৩-’০৮ সালে সেটা বেড়ে দাঁড়ায় ১১টি তে।

গ্রামীণ ও শহুরে জীবনের দিকে তাকালে আমরা ক্রমবর্ধমান দুর্দশা-ই দেখব দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বহুজন জনগণের। গ্রামে আমরা দেখতে পাই ৮৫ শতাংশ মানুষ চাষাবাস করছেন ৫ একরের চেয়েও কম জমিতে, যাদের মধ্যে আবার ৬০ শতাংশ (৩৬ কোটি মানুষ) পরিশুদ্ধ জল থেকে বঞ্চিত। একইভাবে শহরের ৯ কোটি বস্তিবাসি, যে সংখ্যাটা কিনা আবার ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি ২০০১ সালের থেকে, তারাও বাস করছেন একই ধরনের অমানবিক পরিস্থিতিতে।

এবার তাকানো যাক কর্মসংস্থানের দিকে। নিয়মিত চাকরি প্রতিদিনই কমছে। ফলে মানুষকে বাধ্য হয়েই অমানবিক শর্তে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের দিকে যেতে হচ্ছে। সরকারি চাকরিগুলিও নিরাপদ ও নিশ্চিত নয়। ২০০২-২০০৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োগ কমিয়েছে ২৫ শতাংশ, ২০ লাখ থেকে হয়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ লাখ কর্মী কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে।

জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রটির অবস্থাও যথেষ্ট হতাশাজনক। জাতীয় রাজধানী দিল্লিও অসুস্থতায় ভুগছে। ম্যালেরিয়া এক নিউনেমিডিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ভারত সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে বিশ্বে। জনগণের একটা বিশাল অংশ স্বাস্থ্য পরিষেবার বাইরে। পারিবারিক আয়ের একটা বড় অংশ চলে যায় চিকিৎসাখাতে। দামী ওষুধ, ডাক্তারের বিল ও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার। রাজ্য সরকারগুলি মাত্র ০.৫ শতাংশ খরচ করে জনস্বাস্থ্য খাতে, যা ১৯৭০-এ ১ শতাংশ ছিল।

দেশের জনসম্পদের উন্নয়ন বলতে এই হল আমাদের কৃতিত্ব। যেখানে জনগণ তার ন্যূনতম প্রয়োজনটাও মেটাতে পারে নি। আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র তো বহু দূরের কথা। দেশের জনসম্পদে ৯০ শতাংশই প্রায় যেখানে দলিত-সংখ্যালঘু বহুজন সেখানে সবথেকে খারাপ থাকা জনগণের ৯৫ শতাংশই দলিত-সংখ্যালঘু। এর সাথে আছে দৈনন্দিন অবহেলা, অমর্যাদা। হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের শক্তিশালী উপস্থিতি, বহুজন জনগণের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়নের পথকে রুদ্ধ করে রেখেছে, এবং দেশের নৈতিক মেরুদণ্ডকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়ে চলেছে।

এ তো গেল দেশের জনসম্পদের কথা। এবার ছোট করে দেখে নেওয়া যাক প্রাকৃতিক সম্পদের অবস্থাটা।

গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতিকে প্রতিদিন ধর্ষণ করা হচ্ছে উন্নয়নের নামে। জঙ্গল ধ্বংস

করা হচ্ছে তার যাবতীয় সজীব সম্পদকে নিয়েই। বাঁধ দিয়ে নদীগুলির অবস্থা হয়েছে খালের মত। কাঠ মাফিয়াও কাগজ কলের মালিকদের দৌরাঘো জঙ্গল ধ্বংস হচ্ছে পাইকারি হারে। প্রায় ১.৬ লক্ষ হেক্টর জঙ্গল এলাকা চলে গেছে খনি তৈরির জন্য। ১৯৮০-৯৭ সাল অবধি ১৯টি করে খনি তৈরির জন্য জঙ্গল কাটার অনুমতি ছিল বছরে ৯৮.০৫ অবধি, সেটা হয়ে দাঁড়ায় ২১৬টি বছরে। শুধু আকরিক লোহার খনিতেই ০৫-০৬ সালে ৭৭ মিলিয়ন টন জল লেগেছিল। দূষণ প্রতিরোধের নামমাত্র ব্যবস্থা নিয়ে বিভিন্ন খনি পিছু ১.৮৪ টন বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন করেছে ০৫-০৬ সালে, যেগুলি বেশিরভাগই তেলস্ত্রিয়।

জঙ্গল ধ্বংসের ফলে নানা অঞ্চলে খরা ও বন্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে নিয়মিত রুটিন। মাটির নিচের জলস্তরও নামছে। মূলত ভারত সেচ ও পানীয় জলের জন্য ভুগর্ভস্থ জলে ওপরেই নির্ভরশীল।

বর্তমানে ৬০ শতাংশ সেচের জল, ৪০ শতাংশ শহর ও গ্রামীণ জল সরবরাহ নির্ভর করে ভারতে মাটির তলার জলের ওপর। বিশ্ব ব্যাঙ্কের রিপোর্ট অনুযায়ী ২৯ শতাংশ মাটির তলার জল ধারণকারী ব্রক সফটের মুখে। যা ৬০ শতাংশতে পৌঁছে যাবে ২০২৫ সালে। যেখানো শিল্পাঞ্চল ও খনি অঞ্চলে জনপ্রতি জল ব্যবহার ৯১ সালে ৫০০ কিউবিক মিটার থেকে ১৬০০ মিটারে নেমে এসেছে ২০০১ সালে।

ভারত একটি বিশাল প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের দেশ। যদি এই দুই একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে তবে ক'বছরের মধ্যেই এক প্রকৃত উন্নয়ন দেশ দেখতে পাবে। তবে সেটা বহুজন জনগণকে অন্ধকারে ডুবিয়ে ও প্রকৃতিকে ধ্বংস করে হতে পারে না। বরং এদেশের বহুজন জনগণের অধিকারে জল-জঙ্গল-জমি ফিরে এলে তবে তারাই এর রক্ষাবেক্ষণ করে এই দুয়ের মধ্যে এক আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন করে সেই উন্নয়নের দ্বার খুলতে চায়।

কার উন্নয়ন

সরকারের কিছু দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা আছে শিল্প ও বড় ব্যবসার উন্নয়নের জন্য। কিন্তু জনগণের জীবনযাত্রার উন্নয়নের জন্য তেমন কিছু নেই। যা আছে বৈষম্য কমানোর

নামে যা আসলে আগুন লাগবার পর দমকলের কাজ ছাড়া কিছু নয়। যার প্রায় কোনো মূল্যই নেই। ৪র্থ যোজনা কমিশন প্রাথমিক উন্নয়নে ব্যয়বরাদ্দ এক ধাক্কা প্রায় না থাকার জায়গায় নিয়ে গেছে।

তাই আমরা বিশাল ব্যয় বরাদ্দ দেখতে পাই কলর, এয়ারপোর্ট, হাইওয়ে, মোবাইল/ইন্টারনেট-এ। যা মূলত শিল্প ও ব্যবসাকেই সাহায্য করে। আর খুব কম দেখি কৃষি জল, জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষায় যা কিনা জনগণকে সাহায্য করতে পারত।

যদিও সরকার কিছু খরচ করে বৈষম্য, দারিদ্র্য দূরীকরণে তা কিন্তু কোনো আশাব্যঞ্জক ফলই দেয়না। কারণ যা ব্যয়বরাদ্দকরা হয়, তার প্রায় সবটাই মাঝখানের ব্ল্যাকহোলে হারিয়ে গিয়ে যৎসামান্য পৌঁছয় জনগণের কাছে। না আমি দুর্নীতির কথা বলছি না। সেটা দ্বিতীয় বিষয়। আমি বলতে চাইছি এই জনকল্যাণের ভাবনাটির কথা। কতদিন, কতবার কেউ একজনকে বাঁচতে সাহায্য করবে? তার চেয়ে এমন একটা অবস্থা তৈরি করা বেশি বাস্তবসম্মত ও সম্মানজনক নয় কি যাতে প্রত্যেকেই তার যা প্রয়োজন তা সে নিজেই অর্জন করতে সক্ষম হবে ও দেশের প্রকৃত উন্নয়নটা ঘটাতে পারবে? এটাই প্রধান বিষয়।

কিন্তু সরকারের যাবতীয় প্রকল্পগুলিই নিছক রূপকথা। সে যাই হোক NREGA, STRSY, SGSY, IAY, BPL, API, এর একটিই দেশ তথা জনগণেরই দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নকে সাহায্য করে না, না সেচ, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষার নিরাপত্তা দেয়, নিছক ব্যাচ্চাভোলানো রূপকথা।

এবার বিষয় দুর্নীতি যা কিনা এই প্রকল্পগুলিকে আরও অকেজো করে দিয়েছে। ৫০০০ কোটি পার্টির বাজেটের NREGA, যা দরিদ্র জনগণকে ১০০ দিন বছরে কাজ দিতে মাঠে নেমেছিল মনিশঙ্কর আইয়ারের কথা অনুযায়ী এই প্রকল্প ত্রিপুরায় সর্বোচ্চ ৩২.৬ শতাংশ পরিবার, উত্তর ও মধ্যপ্রদেশে ১৪ শতাংশ, ছত্তিশগড় ও ঝাড়খণ্ডে ৮ শতাংশ, ওড়িশা ও উত্তরাঞ্চলে ৬ শতাংশ পরিবারকে যুক্ত করতে পেরেছে। যোজনা কমিশন ২০০৪ সালে স্বীকার করেছে ৫৮ শতাংশ ভর্তুকি দেওয়া খাদ্যশস্য BPL পরিবারগুলোর হাতে পৌঁছয়নি এবং অন্তত ৩৬ শতাংশ কালো বাজারে নিশ্চিতভাবে বিক্রি হয়েছে। সরকারি হিসাবেই যদি এই হয়, বাস্তবতা কি সহজেই অনুমেয়।

জনকল্যানমূলক রাষ্ট্রের চরিত্র কি তা বোঝা যায় এটা দেখেই যে সরকার এখনও এমন কোনো পদ্ধতিই নিয়ে এল না যাতে খাদ্যদ্রব্য কেনা ও মজুত করা যায় সরকারিভাবে।

সরকারীগুদাম তৈরিতে জোর না দিয়ে (যা সারা দুনিয়ায় স্বীকৃত) আজও সরকার গুদাম ভাড়া নিয়ে ও খোলা জায়গাতেও খাদ্যশস্য জমা করে। সরকারী গুদাম আজও হাতে গোনা যখন দেশের কোটি মানুষ না খেয়ে থাকেন, তখন ২০ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য প্রতি বছর নষ্ট হয়, যা দেশের জিডিপি-র ১০ শতাংশ।

অন্যদিকে এই উন্নয়ন মডেল কিছু ধনী মানুষ তৈরি করেছে, যেখানে ১০০ জন ধনীতম ৩০০ মিলিয়ন ডলার, যা ভারতের GDP-র ২৫ শতাংশ ধারণ করেছে। ২০০৯ সালে ৩১৩৫ জন এক্সিকিউটিভ ৫০ লাখ বছরপ্রতি ও ১০০০ জন ১ কোটি আয় করেছেন, কালো টাকা বাদে যার পরিমাণ GDP-র ৪০-৫০ শতাংশ। ২৫ লাখ কোটি প্রতি বছরে বন্টিত হয় বড় বাণিজ্য সংস্থাগুলি, বড় রাজনৈতিক নেতা ও আমলাদের মধ্যে এর কিছুটা চুইয়ে নামে মধ্যবিত্তের মধ্যে এবং দুর্নীতিগ্রস্ত হাতে উৎসাহ দেয়। এভাবেই আরও দুমড়ে যাচ্ছে দেশের নৈতিক মেরুদণ্ড। MP-দের আয় ৩০০ শতাংশ বেড়েছে, ৩৭ লাখ বছর প্রতি হয়েছে।

তাই যা উন্নয়ন চলছে, তা অল্পজনের উন্নয়ন, যা দেশের উন্নয়নে কাজে লাগছে না, জমি ও জনগণের সার্বিক উন্নয়ন ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়।



Nonadanga -- Development without dignity

জাতধর্ম শ্রেণী এবং সম্পত্তিগত সম্পর্ক

বি. টি. রণদিত্ত

ভাষান্তর: সুশান্ত সরকার

সাম্প্রতিক মাসগুলো দেশের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে— গোটা জাতটাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবার ভয়ঙ্কর বিপদটাকে। আসামে চলেছে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, দেশের চারধারে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে কলুষদুষ্ট শক্তিগুলো। এ সবই তো গোটা জাতটাকে টুকরো টুকরো করে দেবারই চক্রান্ত প্রকট। জাতবর্ষ নিয়ে ঝগড়াঝাটি, হরিজনদের ওপরে মর্মস্ফূর্ত অত্যাচার সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। গুজরাটে হরিজনদের বিরুদ্ধে সংরক্ষণবিরোধী আন্দোলন, তাদের অগ্রগতির জন্যে কিছু সুযোগসুবিধা দেবার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কেমনর বেঁধে দাঁড়ানো—এ সবই তো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, খেটে খাওয়া মানুষদের একান্ততার বোধকে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো জাতপাতবর্ষের তাস নিয়ে কেমন খেলা জমিয়েছে। শেষকালে দেখা যাবে, এই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলোই জাতির ঐক্যের ভিতকে ভেঙে চূরে একেবারে নষ্ট করে দিতে, জাতির স্বাধীনতাকে জাহান্নামের পথে এগিয়ে দিতে সাম্রাজ্যবাদীদেরই সাহায্য করছে। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে, দেশ স্বাধীন হবার পর তিন-তিনটে দশক পার হয়ে গেছে, তিন-তিনটে দশক ধরে দেশে চলেছে কংগ্রেসের জমানা, তবুও দেশে কেন জাতবর্ষ নিয়ে এত বাদবিসংবাদ চলেছে? কেন অস্পৃশ্যতা আজও চলেছে? শাসক পার্টির মুখে লম্বাচওড়া দাবির তো খামতি নেই, তবুও এই তিনটি দশকে অস্পৃশ্যদের উপজাতিদের ভাগ্য ফেরানোর জন্যে কেন ছিটেফোঁটাও কাজ হলো না?

এ সবই হচ্ছে অতীতের দুর্ভিক্ষের ফল, অতীতের পাপের বোঝা। উত্তরাধিকার সূত্রে এসব দেশের ঘাড়ের ওপর এসে এখন চেপে বসেছে। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন এই পাপের বোঝা বইবার দায়দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে এই পাপের বোঝা বইবার দায় থেকে রেহাই যে দেওয়া যেতে পারে না, তার কারণ হচ্ছে, আন্দোলনের জাতীয় বুজোয়া মাতব্বরদের মধ্যে এই বিষম সমস্যাটার একেবারে মূলে গিয়ে তাকে শেকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে একটুই আগ্রহ উৎসাহ দেখা যায়নি। ওই মাতব্বররা অস্পৃশ্যতার প্রবন্ধে অপরাধীদের সর্বদা মন জুগিয়েই চলেছিলেন, মিঠে মিঠে আবেদন

নিবেদন, একটু আধটু সংস্কারকার্য—বাস্—এইটুকু করেই ওঁদের সব কর্তব্য সমাপন। ব্যাপারটা যেন কিছুসংখ্যক মানুষের আর জাতবর্ষপ্রথার মধ্যে নিছক সমাজগত আচার-আচরণ ছাড়া আর তেমন কোনো গুরুতর সমস্যা নয়। এই ভয়ঙ্কর সমস্যাটা সমাজের কত গভীরে শেকড় গেড়ে যে বসে গেছে, সে সম্বন্ধে ওই মাতব্বরদের তিলমাত্র জ্ঞানই ছিল না। যদি বা কারুর কিছুটা জ্ঞানগম্য থাকতও, তবুও ওটাকে একেবারে শেকড়গুচ্ছ টেনে উপড়ে ফেলে দেবার মতো বুকের পাটা তো ওঁদেরও ছিল না। এই মহাব্যাধির দাওয়াই তো কৃষিগত সম্পর্কের ভেতরকার সামন্ততান্ত্রিক, আধাসামন্ততান্ত্রিক কাঠামোটাকে একেবারে ধোঁটিয়ে বিদায় করে দেওয়া, এই কাজটি করতে কিন্তু মাতব্বরদের মন চায়নি।

জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন চলছিল, তখন আর একটি অন্তঃস্রোতও তার মধ্যে দিবি বয়ে চলেছিল। সেটা হচ্ছে—জাতপাতবর্ষের ভেদাভেদের, অস্পৃশ্যতাপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই, কৃষিতে বিপ্লব সৃষ্টির জন্য লড়াই—এ সবের ছিটেফোঁটাও সম্পর্ক যেন না থাকে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই—এর সঙ্গে। এর বিফল তো এখন আমরা সবাই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

কমিউনিস্ট পার্টি তার জন্মলগ্ন থেকেই অস্পৃশ্যতার সমস্যা সম্বন্ধে নিজের অস্বাস্ত বোধ-বুদ্ধির পরিচয় রেখেছিল, কৃষিবিপ্লবের সঙ্গে সমস্যাটির গাঁটছড়া বেঁধে দিয়ে। কিন্তু চাষবাস হয় দেশের এমন সব পল্লী অঞ্চলে এবং সার্বিকভাবে সমস্ত দেশটাতেই একটা বৈপ্রবিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারা গেল না, যাতে হরিজন-অহরিজন নির্বিশেষে সর্বসম্প্রদায়ের লড়াই—এরই ভেতর দিয়ে তাদের মধ্যে সব ব্যবধান ঘুচে গিয়ে মিলনের সেতুবন্ধন তৈরি হয়ে যাবে।

হরিজন শ্রমজীবী মানুষ যারা, তাঁদের রয়েছে বিশেষ বিশেষ ধরনের নানা সমস্যা। আমাদের গণসংগঠনগুলি প্রতিদিন জনসাধারণের নানান সমস্যা নিয়ে লড়াই-এর নেতৃত্ব করলেও হরিজনদের বিশেষ সমস্যাবলির সম্বন্ধে তারা কেমন যেন অসাড় নিষ্পন্দ। এটা গণসংগঠনগুলির দুর্বলতারই লক্ষণ বটে। এই সব গণতান্ত্রিক সংগঠন যাতে শ্রৈরতন্ত্রী পার্টির কৃষ্ণিগত না হয়ে পড়ে, তার জন্যে ওই দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতেই হবে। অচ্ছতদের ছোঁয়া থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে সত্ত্বর্পণে চলা মানুষরই সমাজের এক বিরাট অংশ। জাতপাতবর্ষের ভেদাভেদ মেনে চলা এই সব মানুষই হচ্ছে মস্ত বাধা। এই জনোই হরিজনদের দূরে আলাদা করে রাখা সম্ভব হয়েছে।

গুজরাটে যে সংরক্ষণবিরোধী আন্দোলন চলেছে, এবং তা অন্য সব রাজ্যেও যেভাবে সমর্থন পেতে শুরু করেছে, তা কিন্তু আঙুল দিয়ে আমাদের একটা ভীষণ বিপদকে

দেখিয়ে দিচ্ছে। সেটা হচ্ছে—অন্য আর সব খেটে খাওয়া গরিব মানুষ হরিজনদের প্রতি বিবেচনাব্যাপন্ন না হয়ে ওঠেন। হরিজননেতাদের এই বিপদটি সম্বন্ধে সতর্ক হতে হবে। হরিজনদের চালাও সুযোগসুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শাসকরা দেখাচ্ছে, হরিজনরা যেন তাদের কত পেয়ারের ধন। এতে তো অন্য সব খেটে খাওয়া গরিব মানুষদের খেপিয়ে দিয়ে তাঁদের হরিজনবিদ্বেষী করে তোলা হচ্ছে।

সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিরোধিতা করাটা অবশ্য ঠিক কাজ নয়। মনে রাখতে হবে, সংরক্ষণ ব্যবস্থার শুভফলটি হরিজনরা সম্পূর্ণভাবে লাভ করতে পারেননি। হরিজনদের প্রধান বিপুল্যাংগটি, যাঁরা গ্রামাঞ্চলের ভূমিদাস, (বেগার খাটা কিনা মাইনের শ্রমিক) তাঁরা তো এর সুফল থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত। তবে হরিজননেতাদের এটা মনে রাখতে হবে যে, ধনিক-বণিক-জমিদারদের সরকার চাকরিবাকরি পাবার ব্যাপারে হরিজনদের জন্য সংরক্ষণনীতি গ্রহণ করলেও হরিজনদের মুক্তি কিন্তু তাতে আসবে না। সমাজের অন্য আর সব উদযাত্ত গণতন্ত্রটি মানুষদের বিরোধিতা করলে হরিজনদের মুক্তি পাওয়া যাবে না। তা পাওয়া যাবে, সবার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বুজেরিয়া-জমিদারশ্রমীর, আর, তাদের প্রতিভূ বিরুদ্ধে লড়াই-এ হরিজনরা সামিল হলে। যে শ্রেণীসংগ্রাম চলছে, তা থেকে আলাদা হয়ে থাকায় সমাজ থেকে জাতপাত্তাবর্ণভেদকে, অস্পৃশ্যতাপ্রথা থেকে উৎপাতিত করার সব চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, এবং চিরকাল তা ব্যর্থ হবেও।

জাতপাত্তাবর্ণের আচারবিচার, অস্পৃশ্যতাপ্রথা যে উৎকট বিভেদকামী চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিমায আজ সমাজের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তার মোকাবিলা করতে হবে, সংগ্রামশীল খেটে খাওয়া মানুষদের মনে—সবার ওপরে, প্রলেতারিয় একত্ববোধ ও সংহতির ভাবনায় আধুত যে-শ্রমিকশ্রেণী রয়েছেন, তাঁদের মনের মধ্যে জাতবর্ণবিরোধী চেতনার সৃষ্টি করে।

সঙ্গে সঙ্গে গণসংগঠনগুলোকেও, যাদের কাজ সমাজের নিষাতিত নিপীড়িত সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা, তাদের সেই কর্তব্যেরই অঙ্গ হিসাবে অচ্ছতদের, উপজাতিদের, নিপীড়িত জাতের মানুষদের সমস্যাবলির ওপরে সমন্বিত দৃষ্টি দিতেই হবে।

একমাত্র তখনই সম্মিলিত ব্যুৎপন্ন শ্রমজীবী মানুষদের শক্তি মহাপরাক্রমশালী হয়ে ওঠে এমন ধরনের এক কৃষিবিপ্লব নিশ্চয়ই গড়ে তুলতে পারবে, যা জাতপাত্তাবর্ণভেদের ভিতটাকে, অস্পৃশ্যদের ক্রীতদাসদের ভিতটাকে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে। একমাত্র তখনই গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো রাজ্য খুলে দেবে—রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের দিকে, উৎপাদনের সমস্ত উপায়-উপকরণের সমাজতান্ত্রিকরণের ভিত্তিতে দ্রুত শিল্পায়নের দিকে।

একটি গ্রেপ্তার যা ভারতীয় শাসকদের মুখোশকে আর একবার উন্মুক্ত করে দিল
সব্যসাচী গোস্বামী

ফ্যাসিবাদ নানাভাবে, নানাক্রমে ফিরে ফিরে আসে। পুঁজির শাসন যখন বারবার সংকটে পড়ে—তখন তারা আসে ত্রাতা হিসেবে। এখন যেমন চলছে ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পবিত্র ন্যায়ের যুদ্ধ’। সংকট থেকে মুক্ত পাওয়ার জন্য পুঁজির নতুন উদ্যমে যুদ্ধ যাত্রা। এই অ(ন)ন্যায়ের যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি হচ্ছে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভারত সহ বিভিন্ন দেশ এই যুদ্ধের ছোট বড় শরিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যেমন নাৎসিদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ইহুদিরা তেমনিই আজ এদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছেন ইসলাম ধর্মাবলম্বী জনগণ। বিশ্বজুড়ে, এবং আমাদের দেশেও ইসলাম ধর্মাবলম্বী জনগণকে ‘সন্ত্রাসবাদী’, ‘সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষক’, ‘পাকিস্তানের দালাল’ ইত্যাদি বলে চিহ্নিত করে জনমত নির্মাণের কাজটা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। পাশাপাশি চলছে সন্ত্রাসবাদী বলে ধরপাকড়। কয়েক বছর আগেও এ রাজ্যের এক মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন যে মাদ্রাসাগুলি নাকি সন্ত্রাসের আঁতুড় ঘর। সিমিকে নিষিদ্ধ করে মার্কিন পিঠ চাপড়ানিও পেয়েছিলেন বিপ্লব। তথাকথিত বাম শাসনেই যদি এই হাল হয়, তবে বাদ বাকি রাজ্যে কি অবস্থা বুঝতে বাকি থাকার কথা নয়।

কেরালা এমনই এক রাজ্য যাকে তথাকথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের এক গবেষণাগার বলা যেতে পারে। সম্প্রতি শানওয়াজ খান নামক একজন বিশিষ্ট অধিকার আন্দোলনের কর্মী ও আইনজীবীকে কেরালা সরকার গ্রেপ্তার করেছেন। তাঁর অপরাধ তিনি বেশ কিছু মুসলিম যুবক, যাদের কেরালা সরকার নিষিদ্ধ সংগঠন সিমির সদস্য হিসেবে গ্রেপ্তার করেছিল, তাঁদের সপক্ষে কোর্টে সওয়াল জবাব করেছিলেন আইনজীবী হিসেবে, এবং তাঁদের নির্দেশ প্রমাণ করেছিলেন। শুধু তাই নয় - একজন বিশিষ্ট অধিকার আন্দোলনের কর্মী হিসেবে তিনি সংবিধানের ব্যক্তিগত অধিকারের সপক্ষে সওয়াল করেছিলেন এবং জনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। কেরালা সরকারের পুলিশ দপ্তরের হাইটেক বিভাগ, অস্তিত্ব আড়হিশো জনের (যাদের অধিকাংশই মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত) ই-মেল হ্যাক করেছিল, তাঁদের প্রাথমিক অনুমতি ছাড়াই। এই ঘটনা সম্পূর্ণ সংবিধান বিরোধী। রাইট

টু প্রাইভেসি' এই ধারণার পরিপন্থী। শুধু তাই নয় মার্কিন মতাদর্শের দ্বারা উদ্ভুদ্ধ হয়ে তথাকথিত সম্ভ্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-এর নামে ভারত সরকার ও দেশের বিভিন্ন রাজ্যসরকার মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারগুলোতে হস্তক্ষেপ করছে। তাই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন শানওয়াজ ও আরো কিছু অধিকার আন্দোলনের কর্মী। কেরালা থেকে প্রকাশিত মালয়ালম দৈনিক 'মধ্যমাম'-এর সাহায্যে তিনি এই বিষয়টিকে সামনে আনার চেষ্টা করেন, এবং স্বভাবতই কেরালা সরকারের কোপানলে পড়েন।

কেরালা হচ্ছে এমন একটা রাজ্য, যেখানে প্রচুর মুসলিম যুবক, 'সিমির সাথে যুক্ত' এই অভিযোগে নিবর্তন মূলক কালাকানুন ইউ এ পি এ-তে গ্রেপ্তার হয়ে আছেন। শানওয়াজ এই ধরপাকড়ের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম চালিয়েছেন। 'ওয়েজ ওয়ার এগেইনস্ট স্টেট'-এই অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া এই সব মানুষদের বিরুদ্ধে এক মাত্র আইনজীবী হিসেবে সাহসের সাথে তিনি আইনী লড়াইগুলো চালাচ্ছিলেন। এবং আগেই বলেছি অনেকেই তাঁর সওয়াল জবাবের ফলে নির্দেশ প্রমাণ হচ্ছিলেন। শুধু তাই নয়, এক একটা মামলার ক্ষেত্রে, কেরালা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের আধিকারিকরা বিভিন্ন মিডিয়ার সাহায্যে কোর্ট চত্বরে, এবং দুদিন আগে থেকেই সংবাদ মাধ্যম মারফত এই সংবেদনশীল মামলাগুলিকে ঘিরে উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা চালাত। তাঁরা মিডিয়ার সাহায্যে মামলা চলাকালীনই, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগেই, বিচারাধীন বন্দীরা কতটা বিপজ্জনক তার সপক্ষে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করত। উত্তেজনা ছড়াত এবং গুজব রটাত। আইনকে প্রভাবিত করার রাষ্ট্রীয় এ হেন ঘৃণ্য যড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে 'মাইনরিটি রাইটস্ ওয়াচ' সংগঠনের অফিস বেয়ারার হিসাবে তিনি বিভিন্ন পাবলিক মিটিং ও সেমিনারে, পত্রপত্রিকায় মতামত গড়ে তুলছিলেন।

আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি যখন একজন মুসলিম, দলিত, আদিবাসী কিংবা অন্যান্য নিপীড়িত মানুষকে পুলিশ 'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' অভিযোগে গ্রেপ্তার করে, তখন মিডিয়া তাকে নিয়ে কত গল্পই না প্রচার করে থাকে, যা সেই নাগরিককে পুলিশ হেফাজতে এবং জেলে নির্যাতন চালাতে পুলিশকে বৈধতা দেয়, কিন্তু যখন সেই ব্যক্তিই আদালতে নির্দোষ প্রমাণিত হয়, সেই একই মিডিয়া হিরণ্ময় নীরবতা পালন করে। এই হচ্ছে কর্পোরেট মিডিয়ার চরিত্র।

শানওয়াজের ক্ষেত্রেও ভারতীয় মিডিয়া, যারা নাকি আবার নিজেদের রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে ভাবতে ভালবাসে, তাঁরা যথারীতি নীরবতাকেই শ্রেয় বলে মনে করছে।

যদিও শানওয়াজের পক্ষের কাউন্সেলর জানিয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি অভিযোগ আনা হয়েছে, কিন্তু কোনটার থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে কোন মামলা দাঁড় করানো যাবে না।

শানওয়াজের বিরুদ্ধে 'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা'র মিথ্যা মামলা প্রয়োগ, আসলে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকারের উপরই পুলিশী হস্তক্ষেপের এক রূপ। সাধারণভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার প্রতিটি নাগরিকের আইন স্বীকৃত অধিকার হলেও আজকাল চিদাম্বরম মার্কাস মার্কিন বশব্দ শাসকরা বিভিন্ন কালাকানুন তৈরি করে এই অধিকার কেড়ে নিতে উদ্যত। এখন তাঁরা আবার আইনজীবীদেরও গ্রেপ্তার করে এমন একটা বার্তা দিতে চাইছেন, যাতে সংগ্রামী মানুষদের বিরুদ্ধে আর কোন আইনজীবী সওয়াল করতে সাহস না দেখায়। ক'বছর আগে পশ্চিমবঙ্গেও সুদীপ চোন্দারের যাতে কোন আইনজীবী না দাঁড়ায় এস এম এস করে সরকারী নেতারা নিজ দলের আইনজীবীদের সেই নির্দেশ দিয়েছিলেন। এহেন অসৌজন্য নজিরবিহীন। দেবলীনা, নোনাডাঙ্গা সহ গণ আন্দোলনের এক পরিচিত মুখ - তাঁর জামিনের বিরোধিতা করতে, অন্ততঃ দু'জন সরকারি দলের আইনজীবী কোর্টে হাজির হয়েছিলেন। এই হচ্ছে সরকারের রাজনৈতিক সৌজন্যের নমুনা। এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, আমাদের দেশের শাসকদের যে রঙের জামাই পড়ে থাকুক, আর যে রঙের মুখোশই পরে থাকুক - জনগণের কঠরোধ করতে তাঁরা সবাই একই রকম ভয়ানক।

জনদরদী আইনজীবী শানওয়াজ গ্রেপ্তার হচ্ছে জনগণের কঠরোধকে বন্ধ করতে আমাদের দেশের শাসকশ্রেণির একটা হিংস্র আক্রমণের প্রকাশ। এই আক্রমণের মধ্যে দিয়ে তাঁরা এই বাতটি পৌঁছে দিতে চাইছে যে, কোন রকম বিরোধিতাই তাঁরা আজ মেনে নেওয়ার অবস্থায় নেই। এ এক দমবন্ধকর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। যদি এই দমবন্ধকর পরিস্থিতি থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হয়, তবে এই অন্যায আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদে সোচ্চার হতে হবে।

বর্ণাশ্রম-জাতঘণা : প্রসঙ্গ হিন্দুর আত্মমর্যাদাবোধ

দুলালকৃষ্ণ বিশ্বাস

ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের তথ্য হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি হল তার বর্ণতত্ত্ব এবং অতঃপর তার জাতপাত। এই বর্ণতত্ত্বকে আবার বিমূর্ত (abstract) ধারণায় স্থাপন করা হয়েছে মূর্ত মানবদেহকে ভিত্তি করে। সে যুগের সমাজতাত্ত্বিক বা সমাজ-বিজ্ঞানীদের বর্ণ পরিচিতি হল ব্রাহ্মণ। মানবদেহ সম্পর্কে এই সমাজ-বিজ্ঞানীদের জ্ঞান কেমন ছিল তা জানা যায় তাঁদের উল্লিখিত এই বর্ণতত্ত্বের মধ্যে :

যখন তারা পুরুষকে বিভক্ত করল, কতগুলি অংশ তারা পেল ?
তার মুখ, তার হাত দুটিকে তারা কী বলে অভিহিত করল ? কী
বলে অভিহিত করল তার উরুদ্বয় ও পদযুগলকে ?

[অশ্বমেধ দশম' ৯০, R.T.H. Griffith-এর ইংরেজি তর্জমা থেকে]

কী জানতে পারলাম আমরা ব্রাহ্মণের মানবদেহ সম্পর্কিত জ্ঞান সম্পর্কে ? আমরা জানলাম, পুরুষের দেহের চারটি অংশ : মুখ, দুটি হাত, উরুদ্বয় এবং দুটি পা। ঋষিদের ঋষির মানবদেহ সম্পর্কিত এই ধারণার মধ্যে আমরা দেখছি — পুরুষের মস্তিষ্ক বা তার ধারক মস্তক নেই। তার উদর নেই, বক্ষ নেই, নেই সব কিছু দেখার জন্য মূল্যবান চক্ষু দুটিও। আছে কেবল সেই অঙ্গগুলি যেখানে এদেশীয় মানুষের বর্ণগত 'উৎপত্তি' ঘটেছে — মুখ, বাহু, উরু ও পদযুগল। ব্রাহ্মণের চারবর্ণের মানুষেরা প্রথমে ছিল কেবল দুই বর্ণের : একজন কেবল কথা বলবে, যা খুশি মতামত প্রকাশ করবে। তাই তার জন্ম মুখ থেকে - ব্রাহ্মণ। অন্য মানুষটি বল প্রয়োগ করবে, শ্রম করবে। তাই তার প্রয়োজন বাহু, উরু ও পদযুগল। এই মানুষেরা চিন্তা করবে না, তাই তার দরকার নেই মাথার ও মস্তিষ্কের। মুখের কথা, হাতের কাজ, উরু বা পদযুগলের সক্রিয়তা যে মগজ-নির্ভর, একথাও আড়াল করা হয়েছে, অথবা কথাটা তাঁদের হয়ত জানাই ছিল না। এই অবাস্তব পুরুষের পেটেরও প্রয়োজন নেই যেখানে আছে পাকস্থলী, যেখানে খাদ্য গেলে তবেই মানুষ পুষ্টি পাবে, বেরে থাকবে। যতই সুদূর অতীতের কথা হোক, মানুষ চিন্তা করতে

শিখেছে বলেই বেদ রচিত হয়েছে। তাই প্রশ্ন আগে কোন কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন চিন্তাবিদ (ব্রাহ্মণ মাত্রেই চিন্তাবিদ) এমন মনবদেহের ভাবনা ভাবতে পারেন।

এর উপর আবার এই চিন্তাবিদদের মস্তক-প্রসূত চারবর্ণের জন্মকাহিনী। এমন জন্মসংক্রান্ত ভাবনা যাঁরা ভাবতে পারেন, তাঁদের তো চিন্তাবিদ বলতেই হবে। এবং যথার্থই তাঁরা সমাজ-বিজ্ঞানীও বটে। কেননা, এমন বর্ণব্যবস্থা দ্বারা যেভাবে শ্রেণিস্বার্থকে 'দৈবানুমোদন' দেওয়া হয়েছে, তা থেকে বলা যায়, এখনকার পুঞ্জিতন্ত্রের দার্শনিকরা একেবারে নাবালক শিশু। ভাবুন তো, মানুষের জন্ম হয়েছে ব্রহ্মা নামক এক অদ্বিত প্রাণির মুখ থেকে, বাহু থেকে, উরু ও পা থেকে। এমন ভাবনাকে আদিমতা বলে এড়িয়ে যাওয়া চলে না। কেননা, এই ভাবনাগুলি এসেছে বেদ নামক প্রাচীনতম গ্রন্থের উপাদান হিসেবে, যে-গ্রন্থ রচনার জন্য মানুষের চৈতন্যের বিকাশকে একটা উচ্চতর পর্যায়ে উঠতেই হয়। এখন অবশ্যই আমরা ভাবতে পারি, শ্রেণিস্বার্থের স্থূল বহিঃপ্রকাশের এই 'দৈব' জন্মবৃত্তান্ত সুদূর অতীতে ব্রাহ্মণ্য স্বার্থকে আড়াল করলেও, এদেশে মানবসভ্যতার বিকাশ ও সামাজিক অগ্রগমনকে একেজো করে দিয়েছিল। ব্রাহ্মণের এই জ্ঞান-চর্চা সামগ্রিকভাবে তাদের সংকীর্ণ সমাজকেন্দ্রিক মানসিকতায় আবদ্ধ করে, এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অর্থাৎ শ্রমের ক্ষেত্রে জ্ঞানচর্চার প্রয়োগ না ঘটায় উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের অভাবে ভারত সভ্যতা স্থবিরতায় আক্রান্ত হয়।

ব্রাহ্মণের ব্রহ্মা নামক কল্প-‘দেবতা’র অবস্থাটা একবার ভাবুন। তার জননাস হল মুখ, বাহু, উরু ও পা। জানা যায়, কিছু নিম্নস্তরের প্রাণি আছে, যাঁরা মুখ দিয়ে প্রসব করে; কিন্তু কোন প্রাণিই বাহু, উরু বা পা-কে জননাস হিসেবে ব্যবহার করে না। অথচ এই স্থূলতাকে অতিক্রম করে এদেশে সূক্ষ্ম শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি হলেও এই উদ্ভট ব্রহ্মাকেও সে সব সাহিত্যে স্থান দিয়ে টেনে আনা হয়েছে আধুনিক কাল পর্যন্ত এবং আরও আশ্চর্য ঘটনা হল, এই ব্রহ্মা-ভিত্তিক উদ্ভট জন্মতত্ত্ব দিয়ে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সমাজটা আজও দিব্যি টিকে আছে এবং তাতে না কোন লজ্জা বা প্লানি অনুভব করেন ব্রাহ্মণ, না কোন ঘণা বা ঘ্রোষ দেখতে পাই হিন্দু নামক ব্রাহ্মণতন্ত্রের মধ্যে। কী বিচিত্র হিন্দুচেতনা!

এই বর্ণ-সম্পর্কিত তত্ত্ব বিজ্ঞান স্বীকার করে না। কিন্তু নিজেকে যাঁরা হিন্দু ভাবেন তাঁরা তাঁদের সাংস্কৃতিক চেতনায় এ তত্ত্বকে মানেন, এমনকি বিজ্ঞানী হলেও মানেন, যা বুঝতে পারা যায় বিশেষ ইচ্ছাশক্তি দিয়ে। বিজ্ঞানের এই অস্বীকৃতি বলতে কেবল প্রজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের অস্বীকৃতি নয়, সাধারণ মানুষও আজ আর গ্রহণ করেন না যে নানা বর্ণ ও জাতের মানুষের জন্মবৃত্তান্তটা একরূপ। অথচ তাদের চৈতন্যে এই বিশ্বাস গেঁথে থাকায় তারা বর্ণ

ও জাত বিভাজন অস্বীকার করেন না।

কিন্তু প্রশ্ন হল, আধুনিক শিক্ষা থেকে যদি মানুষ সামান্যতম বিজ্ঞানচেতনা অর্জন করে তবে তো তার পক্ষে এমন সংস্কার বহন করা সম্ভব নয়। তবুও জন্মসূত্রে হিন্দুদের এক অতি নগণ্য সংখ্যক ব্যতীত সবাই এমন উদ্ভট জন্মবৃত্তান্ত-ভিত্তিক বর্ণ ও জাত ব্যবস্থা মেনে চলেন। চেতনার জগতে এমন ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁরা এমন অযৌক্তিক জাতপাতে আত্ম-সমর্পিত? মানুষের যে মৌলিক স্বাভাৱ্যতা, তার আত্মানুভূতি ও আত্মসচেতনতা, তা থেকে কি তবে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র অর্থাৎ হিন্দুধর্ম হিন্দুদের বঞ্চিত করেছে? তেমন হ'লে হিন্দুরা আজও নিজেদের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেন না, এমন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কেননা, কার্ল মার্কস জানাচ্ছেন:

Man makes religion, religion does not make man. In other words, religion is the self-consciousness and self-feeling of man who has either not yet found himself or already has lost himself again. [pp226-7, Reader in Marxist Philosophy, Selsam & Mrtel.]

[মানুষ ধর্ম সৃষ্টি করেছে, ধর্ম মানুষ সৃষ্টি করেনি। অন্য কথায়—
ধর্ম হল সেই মানুষের আত্মচেতনা ও আত্মানুভব যে হয় নিজেকে এখনও খুঁজে পায়নি অথবা পেয়েও হারিয়ে ফেলেছে।]

মানুষের 'হিন্দু' আত্ম-পরিচয়ের মধ্যে এমন এক আত্মমর্যাদাবোধের অভাব দেখা যায় যে তাতে তাদের মানুষ ভাবা গেলেও মর্যাদা-সম্পন্ন মানুষ বলা যায় না। কেননা, 'হিন্দু' পরিচয়ের দাবিটি তো হল এই, যে একজন মানুষ জন্মগত কারণেই অন্য এক হিন্দু মানুষের নিকট ঘৃণিত বা ঘৃণী। ঘৃণিত মানুষ যেমন মর্যাদার দাবি জানাতে পারে না, তেমনি ঘৃণী মানুষও তার ভূমিকায় মর্যাদাবান নয়।

অধিকন্তু হিন্দু সমাজের চিরায়ত ঘৃণিতরা, অর্থাৎ শূত্রেরা একদা শিক্ষা ও শিক্ষা-সংস্কৃতি থেকে বঞ্চিত থাকায় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের এই ক্রমিক ঘৃণার সামাজিক চালিয়াতি ধর্মের নামে মানতে বাধ্য হলেও, আজও তাদের শিক্ষিত অংশ পর্যন্ত (কায়স্থ-বৈদ্য সমেত) ব্রাহ্মণ সাপেক্ষে নিজেদের হীনতর বা ঘৃণিত ভাবেন। এদের কি কোন যথার্থ মানবিক চেতনার মানুষ বলে বিবেচনা করা চলে? মানুষ হলেও শূত্র হিন্দু আসলে ঘৃণা মানুষ। আর যেহেতু শূত্র নিজেকে হিন্দু ভাবেন, তাই তিনি নিজেকে ঘৃণিত ভাবেও বাধ্য। অপরদিকে

ব্রাহ্মণ জানেন, তিনি আলো ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সাপেক্ষে উচ্চতর কেউ নন। তথাপি তিনি শূত্র সম্পর্কে চেতনায় ঘৃণা বহন করেন। এবং এমন মানসিকতাও নিশ্চয়ই কোন মানুষের, মর্যাদাবান মানুষের, বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।

এ জনাই এমন সিদ্ধান্ত নিতেই হয় — ঘৃণিত ও ঘৃণী হিন্দু অর্থাৎ সব হিন্দু আত্ম-মর্যাদাহীন মানুষ।

উপসংহার :

ইংরেজ আগমনের ফলে এসেছে আর্থ-ভিত্তিহীন এক সাংস্কৃতিক জাগরণ ঘটেছিল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধাপ্রাপ্ত অংশের মানুষের মধ্যে। এই জ্ঞানালোকায়নের যুগে (age of enlightenment) এসেছে বেশ কিছু বিশাল মাপের মানুষের জন্ম হয়েছিল যারা বিশ্বয়করভাবে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অমানবিক সমাজ-সংস্কার সম্পর্কে নীরব ছিলেন। কিছু বিরাপ মন্তব্য ব্যতীত কেউই এই ধর্ম যে এক অমানবিক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, এবং ওটা যে কোন আত্মমর্যাদাবান মানুষের পরিচয় হতে পারে না, এমন কথা কেউ সরাসরি বলেন নি। কেন মনুষ্বৃতি নামক ধর্মগ্রন্থকে অমানবিক স্থূলতা এবং বর্বরতার শাস্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করতে জ্ঞানালোকায়নের যুগের জ্ঞানী-গণীজন অনাগ্রহী হলেন? ব্রাহ্মণ্যতাত্ত্বিক উত্তরাধিকার, ইংরেজ আগমনের পূর্বে, এসেছে জ্ঞান-চর্চার জগতে যে স্ববির ভাবমণ্ডল গড়ে তুলেছিল, তাঁরা কি তখনও সেই স্ববিরতাকে অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন? নাকি, সত্যও আপেক্ষিক! সত্যও আসলে শ্রেণি সত্য। তাই তাঁরা তাঁদের শ্রেণি সত্যকেই, মৌন থেকে সমর্থন করে গেছেন?



সাতাশে ফেব্রুয়ারি

সৌমিত্র দত্তদার

সাতাশে ফেব্রুয়ারি আসার বেশ কয়েকদিন আগেই কলকাতা এক বিখ্যাত দৈনিকের বিশিষ্ট সম্পাদককে ফোন করে বলেছিলাম, ‘আর কয়েকদিন বাদেই গুজরাত গণহত্যার দশ বছর পূর্ণ হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই এখন সেখানকার পরিস্থিতি কেমন তা নিয়ে উত্তর সম্পাদকরা লিখতে চাই।’

সম্পাদক আমাকে নিরাশ করলেন। বললেন সামনে কয়েকটি রাজ্যে নির্বাচন, এখন হিন্দু-মুসলমান, বাবরি-গুজরাত এসব স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে না লেখাই ভাল।

অন্য রাজ্যে নির্বাচনে বাংলা কাগজের উত্তর সম্পাদকীয় কতটা প্রভাব ফেলবে তখনও বুঝিনি। আজ এতদিন বাদেও বুঝতে পারছি না। শুধু এটুকু মনে হচ্ছে গুজরাত যেন ক্রমেই পিছনে চলে যাচ্ছে। অনেক বুদ্ধিজীবীও মাঝেমাঝে বলেন, ‘আরো গুজরাত গুজরাত এবার বাদ দাও, অনেক হয়েছে।’ মোদীর শিল্পায়নের প্রশংসা করে বরং প্রবন্ধ লেখো।

কিন্তু চাই বা না চাই, গুজরাত গণহত্যা এত সহজে বিবর্ণ হয়ে যেতে পারে না। সাতাশে ফেব্রুয়ারি নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা উত্তর ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার পাশে এক কালো দিন। ঠিক যেমন আর এক অন্ধকার সময় উনিশশো বিরানব্বই সালের ৬ই ডিসেম্বর। বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে দিয়ে এদেশের সংখ্যালঘু ভাবাবেগে আঘাত হানা হয়েছিল। ২০০২ সালের সাতাশে ফেব্রুয়ারি নরেন্দ্র মোদীর রাজ্যে আপাত অখ্যাত গোধরা স্টেশনে সবরমতী এক্সপ্রেসের এস ৬ ও ৭ নম্বর কামরায় অজ্ঞাত কারণে আগুন লেগে বহু সাধারণ লোকের মৃত্যুর পরে পরেই যেভাবে অত্যন্ত সংগঠিত ও পরিকল্পিত ভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশালসংখ্যক জনগণকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল তা দেশের ভাবমূর্তি পৃথিবীর সর্বত্র স্তান করে দিয়েছিল।

আজও সেই বিপর্যয় থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়নি গুজরাত। এখনও যতই আড়াল করা হোক আদতে সত্যি এটাই। আহমেদাবাদ, বদোদরা, ভাবনগর, সুরাত সহ রাজ্যের

বিভিন্ন জায়গায় মুসলিম জনগণ অনেক ক্ষেত্রেই এখনও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়েই রয়ে গেছেন।

যে গোধরা নিয়ে এত কথা তার কাছেই সিগনাল ফালিয়া। কোনও ট্রেনের সিগনাল ফেল করেছিল বলেই বোধহয় ওই নাম। লাইনের ধারে ধারে অজস্র মুসলিম বসতি। ঘাটি মুসলিমদের বাস। ঘাটি হচ্ছে তেলি সম্প্রদায়। শোনা যায়, নরেন্দ্র মোদী নিজেও ওই একই সম্প্রদায়ের। অনেক অনেক কাল উচ্চবর্ণের অত্যাচারে নিম্নবর্ণের মোদীর জাতি-স্বজনেরা দলে দলে মুসলিম হয়ে বাঁচার পথ খুঁজেছিল।

কী অদ্ভুত সমাপতন। তখন কে আর জানত তাদের উত্তরসূরীদের নিয়ান্তিত হতে হবে তেলি সম্প্রদায়েরই এক শাসকের হাতে। ২০০২ সালে গুজরাত গণহত্যার সময়েই ক্যামেরা নিয়ে মোদীর রাজ্যে চলে গেছিলাম। সে এক অন্য অভিজ্ঞতা। তখন বলতাম, এখনও মনে করি যার ওই সময়ের জ্বলতে থাকা অভিশপ্ত গুজরাত দেখেননি তারা বুঝতেও পারবেন না স্বাধীনতার এতদিন বাদে নব্য হিন্দুত্ব কিভাবে রাজ্যে রাজ্যে মুসলিম বিদ্বেষ তৈরী করেছে। আওয়াজ তোলা হচ্ছে যো হিন্দু কা হিত করোগা ওহি দেশ মে রাজ করোগা। বলা হচ্ছে হিন্দু-হিন্দু-হিন্দুস্তান, মুসলিম ভাগো পাকিস্তান।

অথচ গণহত্যার পরেও যতবার গুজরাত গেছি একজন মুসলিমও পাকিস্তানে চলে যাবার কথা বলেনি। বরং জানিয়েছে, এই ভারত আমার দেশ। পাকিস্তান কোথায় তা ভাল করে জানিই না। এক প্রবীন নখেদে জানিয়েছিলেন গেলে তো আগেই পাকিস্তানে চলে যেতে পারতাম।

গোধরায় সেই প্রথমবার যাওয়ার অভিজ্ঞতা কোনওদিন ভুলবো না। স্টেশনে, প্রাটফর্ম থেকে খানিকটা দূরে সেই অভিশপ্ত ট্রেনের বগি তখনও দাঁড়িয়ে। গলিটা যেন বিজ্ঞাপনের মত জানান দিচ্ছে — দেখো দেখো ওই ট্রেনে যেভাবে হামলা হয়েছিল তার প্রেক্ষিতেই তো মুসলিম নিধন। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সগর্ব উচ্চারণ — ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া তো হবেই।

গোধরার ঘটনায় অভিযোগের আঙুল তোলা হয়েছিল সিগনাল ফালিয়ার বাসিন্দাদের দিকে। প্রথম যেদিন ওই মহল্লায় গেছিলাম ভয়ে সেদিন কেউ নিজের নাম বলতেও রাজি হচ্ছিলেন না।

এরপর ঠারেঠোরে ভাব জমিয়েছিলাম। খাটিয়ায় বসে জমিয়ে আজ্ঞা মেরেছি। বসতিটা

আমাদের মেটেবুজ-রাজাবাজার-টিটাগড়ের যে কোনও মুসলিম এলাকার মতই। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম সব দোকানে দোকানে সারি সারি ঠাণ্ডা পানীয়ের বোতল। কোনওটাই কিন্তু বহুজাতিক কোক-পেপসি নয়। গোটা দুনিয়া জুড়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক জেহাদের এক খন্ডচিত্র উঠে এসেছিল হতদরিদ্র ওই মুসলিম মহল্লায়।

গোধরার ট্রেনে আগুন লাগানোর জন্য ওই বস্তির বাসিন্দারা কতটা দায়ী তা নিয়ে বহু তদন্ত হয়েছে। কোনও তদন্তেই তাদের যোগ আছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। নানা সূত্র, আমাদের অভিজ্ঞতা, সব মিলিয়ে যা মনে হয়েছে তা এই— অযোধ্যা ফেরৎ উন্নাত করসেবকেরা যে বিভিন্ন স্টেশনেই সংখ্যালঘুদের বিবিধ প্ররোচনা দিচ্ছিল, গালাগালি, ঠাট্টা-তামাশা, টিটকিরি, কিছুই বাদ ছিল না, গোধরা স্টেশনে তা চরমে ওঠে। ফলে সেখানকার স্থানীয় মুসলিমরা তার প্রতিবাদ করে। তখন দুপক্ষে বচসা ও খন্ডযুদ্ধ বেধে যায়। ট্রেনে ইট-পটিকেল ছোঁড়া হয় কিন্তু মুসলিমরা আগুন দিয়েছে এমন বলা যায় না।

তদন্তে এও জানা গেছে যে বিস্ফোরক সম্ভবত ট্রেনেই মজুদ ছিল। তা নিয়ে ট্রেনের কর্মী ও কিছু যাত্রী গার্ডকে সতর্কও করেছিলেন। গার্ডও কর্তৃপক্ষকে তা জানিয়েছিলেন। কিন্তু উর্বরতন রেল কর্তৃপক্ষ তাতে কান দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরাও বলেছিলেন যেভাবে আগুন লেগেছিল তা ভেতরে দাহ্য বস্তু না থাকলে ঘটতো না। একশো পনেরা জন মারা গিয়েছিলেন। তার মধ্যে তিন-চারজন করসেবক। অধিকাংশই সাধারণ যাত্রী। অথচ করসেবকেরা ছিলেন সংখ্যায় প্রচুর। তারা কিভাবে কোন অজ্ঞাত কারণে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছলেন তাও এক বিস্ময়।

গুজরাত নব্য হিন্দুত্বের ল্যাবরেটরি, যার সূচনা হয়েছিল আরো আগে। লালকৃষ্ণ আদবানীর রামরথ যাত্রার মধ্যে দিয়ে। যার পরিণতি ঐতিহাসিক প্রাচীন অনুপম স্থাপত্যের বাবরি মসজিদ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে, দেশব্যাপী দাঙ্গা করে মুসলিম মানসিকতায় আতঙ্কের জন্ম দেওয়া।

গুজরাতে যা হয়েছে তা আর নতুন করে বলার নয়। বিভিন্ন জায়গায় হাজার হাজার মুসলিম নারী-পুরুষ-শিশুদের খুন, ধর্মন, বাড়ীতে আগুন লাগানো কিছুই বাদ দেয়নি সংঘ পরিবারের কর্মী-সমর্থকেরা। তাদের সঙ্গে সক্রিয় ছিল সরকারী পুলিশও। করসেবকেরা প্রকাশ্যেই জানিয়েছিলেন— ‘ইয়ে গর্ব কী বাত হ্যায়, পুলিশ হামারে সাথ হ্যায়।’ কত মাজার, দরগা, মন্ডব ধুলোয় মিশে গেছে একদা শাসক আহমেদ শাহ আবদালির সাধের

রাজধানীতে কে আর তার হিসেব রাখে! যে সময়ের কথা বলছি তখন বেশীরভাগ জায়গায় প্রকাশ্যে আজানও নিষিদ্ধ হয়েছিল। প্রাচীন গান্ধীবাদী এস.এন. পাঠক ছাড়া কোনও বুদ্ধিজীবী পাইনি যিনি প্রকাশ্যে ক্যামেরার সামনে মুখ খুলবেন সাহসের সঙ্গে। পাঠক সাহেব সখেদে বলেছিলেন, এন এথনিক ক্রিনজিং। জানতে চেয়েছিলাম একথা বলছেন ভয় করছে না? একানবই বছরের অধ্যাপক হোসে ফেলেছিলেন, এই বয়সেও যদি সত্যি কথা বলতে ভয় পাই তাহলে আর আমরা কিসের বাপুর চেলা!

মৌদীর গুজরাতে হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছিল এ মোটেও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্মভূমি নয়, এ যেন শুধুই বয়লভাই প্যাটেলের বাসভূমি যার দস্তই একদিন মহম্মদ আলি জিন্নাকে ঠেলে দিয়েছিল দেশভাগের সিদ্ধান্তের দিকে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের বিখ্যাত সেই ‘ইত্তিহা উইনস ফ্রিডম’ অবলম্বনে বিখ্যাত অভিনেত্রী টম অলটারের আড়াই ঘণ্টার এক চমৎকার একক নাটক আছে যার মুখ্য উপজীব্য উনিশাশো সীইত্রিশ থেকে সাতচল্লিশ এদেশের রাজনীতির সবচেয়ে বিতর্কিত ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যা দেখলে তথাকথিত লৌহমানবের হিন্দুয়ানা আরও স্পষ্ট হবে।

দেখতে দেখতে গুজরাত গণহত্যার দশবছর হয়ে গেল। আমাদের মূলধারার প্রচার মাধ্যম এখন আর সেভাবে গুজরাতের কলঙ্কিত সময় নিয়ে খুব একটা সোচ্চার হয় না। নতুন প্রজন্মকে জানতে দিতে চায় না কলঙ্কের ইতিহাস। তরুণেরা বড় হয় মৌদীর গুজরাতের শিল্পায়নের গৌরব-নিদানের মধ্যে। ভারতের উন্নয়ন মানচিত্রে গুজরাত নাকি এখন এক নম্বরে। টি.ভি-র বিজ্ঞাপনে বোম্বে সিনেমার শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চন স্বপ্ন দেখান আরো আরো বেশি উন্নয়নের, আরো বেশি পুঁজি লাগির।

এতসব ঢকানিনাদে চাপা পড়ে যায় সেই বাচ্চা ছেলে জাভেদ আলম যে চোখের সামনে একদিন নিজের পরিবারের দশজনকে খুন হতে দেখেছিল। ভুলিয়ে দেওয়া হয় বৃদ্ধ নুরউদ্দীনকে যিনি দেখতে বাধ্য হয়েছিলেন নিজের গর্ভবতী মেয়ের পেট চিরে বাচ্চা বার করে আগুনে পোড়াতে পোড়াতে উন্নাত করসেবকেরা চেষ্টা করে উঠেছিল ‘ইয়ে তো সির্ফ ঝাঁকি হ্যায়, মথুরা কাশী বাকি হ্যায়’। মথুরা কাশীর প্রাচীনত্ব ধ্বংসের চেয়েও গোটা হিন্দুত্বকে মুসলিম সংখ্যালঘু জনতা ভয়ে নীরব হয়ে গেছিল নিজেদের আসন্ন সর্বনাশের কথা ভেবে।

মৃত্যুর হাহাকারের পরেও জীবন থেমে থাকে না। দশবছর পরে আবারও তাই গুজরাতের মুসলিম মহল্লায় প্রাণের স্পন্দন আপনি টের পাবেন।

কিন্তু সত্যি কী শাস্তি ফিরেছে গুজরাতে? পুনর্বাসন যা হয়েছে তার পিছনে সিংহভাগ কৃতিত্বই নিঃসন্দেহে বিভিন্ন মুসলিম সংস্থাগুলোর। সরকার মুখে যা বলেছে কাজে তার সিকিভাগও করেনি। তবু এই দশবছরে গুজরাত নিঃসন্দেহে বদলেছে। নীচুতলার সংখ্য পরিবার যতই মুসলিমদের হুমকি দিয়ে নিজেদের তাঁবে রাখতে চাক, দীর্ঘ সময় ধরে সারাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ জনগণের প্রবল চাপে মোদীর সরকার হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠার ঘোষিত নীতি থেকে অন্তত প্রকাশ্যে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে।

সারা দেশেই বি.জে.পি.র তত্ত্ব নতুন করে আমদানী করার প্রবল চেষ্টাও কমবেশি সর্বত্রই জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে। গুজরাতেও নতুন প্রজন্ম ভারতের সাবেক ধর্মনিরপেক্ষ নীতির প্রতি আস্থাশীল।

কিন্তু পাশাপাশি এও মনে রাখতে হবে দেশে অর্থনীতির সঙ্কট যত বাড়বে, উগ্র হিন্দুত্ব ফের হিংস্র হয়ে উঠতে চাইবে। হিন্দুত্বের দর্শন যে ফ্যাসিবাদী দর্শন, নাৎসীবাদ, সেও চেষ্টা করছে পৃথিবীর নানা দেশে আবার সক্রিয় হবার, মাথা তোলবার।

ফেব্রুয়ারি সাতাশও তাই গুরুত্বপূর্ণ। ওই দিনেই গোথরা হয়েছিল। ওই একই দিনে নাৎসীরা দেশের সংসদ রাইখস্ট্যাগে আগুন লাগিয়ে কমিউনিস্টদের ওপর দোষ চাপিয়েছিল। বস্তুত, সাতাশের পর থেকেই নাৎসী জয়যাত্রার শুরু। ইহুদী ও কমিউনিস্ট বিনাশেরও। নবনাৎসীরাও নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করতে সাতাশে ফেব্রুয়ারিকে বেছে নেয়। বিভিন্ন দেশে বিবিধ নাশকতার মধ্যে দিয়ে সে জয়গান গায় ফ্যাসিবাদের। নাৎসীদেরও।

তাদের ঘোষিত ও পয়লা নম্বর শুরু আজও সারাবিশ্বের বামপন্থী শক্তি। তাই সাতাশ ফেব্রুয়ারি শুধু একটা নির্দিষ্ট কোনও দিন নয়। দর্শন বনাম দর্শনের সংগ্রামেরও দিন।

বেছে নিতে হবে ব্যক্তিনির্ভর ফ্যাসিস্ত হাজার না সাম্যবাদী দর্শন, আপনি কার দিকে।



Godhra (Gujrat) Conspiracy

অন্ধকার

সৌপত চট্টোপাধ্যায়

অন্ধকার বাড়ে

শীতের চাতলে রক্ত ঝরে পড়ে

বনিক সভ্যতার

সহমরণে উর্বশী ভেসে ওঠে প্রিয়তম বলে

সলিল চৌধুরীর সুরে সুরে

ফুরিয়ে যায় পাড়ার রোয়াকে সন্ধ্যা

সিগারেটের ধোঁয়ার অন্ধকারে

পুড়ে যায় সময়ের বাদামী অনু পরমাণু

শীতের সন্ধ্যায় রাতে

অন্ধকার বাড়ে

বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে

মানুষের রক্ত ঝরে পড়ে।

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তবে জাত-পাতমুক্ত মন শ্রীচৈতন্যের বাস্তবে ছিল কি না, তা নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্ক রয়েছে। তবু তাঁর কৃষ্ণ নাম সংকীৰ্তন আন্দোলনে কায়স্থ (হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী শূত্র) ও বহু জল-চল সমাজ এবং চৈতন্য পরবর্তীকালে জল-আচল সমাজ বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করার প্রকাশ্যে কৃষ্ণ নাম করার সুযোগ পায়। এভাবে গোটা বাংলাদেশের কয়েক লক্ষ মানুষকে তিনি হিন্দুধর্মের মোহজালে বেঁধে রাখতে সক্ষম হন। মোহজাল বলছি এই কারণে, হিন্দুধর্ম নামে আসলে কোন ধর্ম নেই। হিন্দুধর্ম আসলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। বলা যায়, যে ধর্মে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বা শাসক স্বার্থ বজায় থাকে সে ধর্ম হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত। প্রয়োজনে কিছু 'সর্বধর্ম সমন্বয়' বাণী প্রচার করে সভ্যতার পিলসূজ মাটি মাখা মানুষদের শোষণ করার পথ সুগম রাখা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, অযোধ্যার অসহায় যুবরাজ রামচন্দ্রের গুহকরাজ চণ্ডালের সঙ্গে মিত্রতা করার ঘটনাকে সামনে রেখে মানবতার কথা প্রচার করা, আবার সুযোগ মত শত্রুককে হত্যা করে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের শোষণ করার পথ প্রশস্ত করা। এদেশের শ্রমজীবীরা একবারও তলিয়ে ভাবে না যে, কোন পরিস্থিতিতে পড়ে রামচন্দ্রের চণ্ডালদের সঙ্গে মিত্রতা করে আর সমাজের কোন অবস্থানে আসতে গেলে শত্রুকদের মত সত্য অন্বেষক মানুষদের নিহত হতে হয়। যাই হোক, একথা আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি হিন্দুধর্ম ব্রাহ্মণ্য স্বার্থে পুরোদমে শাসন ও শোষণ চালায় শ্রমজীবীদের উপর। মূল প্রসঙ্গে আসা যাক — শ্রীচৈতন্য মৃত্যু নিয়ে দুটি মতবাদ সবচেয়ে বেশি প্রচারিত —

- (১) হু কৃষ্ণ হু কৃষ্ণ বলতে বলতে শ্রীচৈতন্য পুরীর মন্দিরের জগন্নাথ মূর্তির সঙ্গে মিশে যান।
- (২) শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণপ্রেমে এমন বিভোর হয়েছিলেন যে সমুদ্রের জলকে কৃষ্ণ ভ্রমে জলে ডুবে বিলীন হয়ে যান।

সর্বাধিক প্রচারিত এই অন্তর্ধান রহস্য সচেতন নাগরিক কোন অবস্থাতেই মেনে নিতে পারেন না। মৃত্যু রহস্য নিয়ে আর একটি মতবাদ প্রচলিত আছে। তা হল — পুরীর পাণ্ডারা পৌরাষকে খুন করে গোপনে কবর দিয়ে দেয়। কবিরাজ কৃষ্ণ দাস নিজেই তাঁর 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থের ৩ পরিচ্ছেদে লিখেছেন —

মহাপ্রভুর যে শেষ জীলা স্বরূপ দামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥

শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যপর্বের একান্ত ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছিলেন নবদ্বীপের পুণ্ডরীক আচার্য বা স্বরূপ গোসাঁই বা স্বরূপ-দামোদর। যিনি পুরীধামে মহাপ্রভুকে প্রতিনিয়ত রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। তাঁর 'স্বরূপ দামোদরের কড়চা' আজও আবিষ্কার হয়নি। অথচ কলকাতা থেকে বৈষ্ণবপন্থার নিগূঢ় সাধনভজন সংগ্রহস্থ দু-একটি পুস্তক 'স্বরূপ-দামোদরের কড়চা' নামে ছাপা হয়েছে।

প্রশ্ন জাগে, কারা স্বরূপ দামোদরের কড়চা চেপে রেখেছেন বা নষ্ট করে দিয়েছেন? একদল বই ব্যবসায়ী যারা 'স্বরূপ-দামোদরের কড়চা' নামে অবচীন লেখা ছেপে প্রকাশ করেছেন, তাদের মূল উদ্দেশ্য কী? কেবল অর্থ উপার্জন, নাকি মানুষদের ভ্রান্তপথে চালনা করাও?

প্রখ্যাত লোচন দাস ও বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা অনুযায়ী কিছু প্রভেদ চোখে পড়ে। লোচন দাস বলেছেন, — শুভিচা বাটিতে প্রভু জগন্নাথের সঙ্গে লীন হয়েছেন। আর বৃন্দাবন দাস বলেছেন, — 'জগন্নাথ পরশিয়া হৈলা অন্তর্ধান।' এই 'লীন' আর 'অন্তর্ধান' শব্দ দুটির মধ্যে ব্যুৎপত্তিগত পার্থক্য আছে অনেক। অন্তর্ধান অর্থে তিরোধান, তিরোভাব, অদৃশ্য হওয়া, লুপ্তি হওয়া বা দর্শনাভীত স্থানে গমন। অন্তর + ধা + অন বা অন্তর + ধা + অন্তি ভাবে 'অন্তর্ধান' শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে। আর 'লীন' অর্থে লয় প্রাপ্ত, মিলিত, শায়িত বা সংসক্ত।

আসলে শব্দ নিয়ে সমস্যা হত না যদি কিনা লোচন দাস, জয়ানন্দ ও বৈষ্ণবচরণের মতামতে কোন পার্থক্য না থাকত। লোচনদাস আর জয়ানন্দ বলেছেন, তিথিটা সপ্তমী। বৈষ্ণবচরণ বলেছেন, — পূর্ণিমা। কিন্তু দিনটা ছিল রবিবার। তিন জনই বলেছেন রাত্রি দশ দণ্ডের সময়। কিন্তু বৈষ্ণবচরণ যে নতুন তথ্যটি দিয়েছেন তা হল, — গুরুড় স্তম্ভের কাছে প্রভুর মৃতদেহ পড়েছিল। গুরুড় স্তম্ভ মূল মন্দিরের সামনে সিংহ দরজার সম্মুখে। এ প্রসঙ্গে আরেকটি তথ্য হল —

কি করিব কোথা যাব বাক্য নাহি শূন্যে।
মোর প্রভুরে হারালাম গোপীনাথের ঘরে ॥

অর্থাৎ গোপীনাথের মন্দিরে মৃত শ্রীচৈতন্যকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। তবে এক্ষেত্রে আরো পরিষ্কার হওয়া যেত যদি কিনা 'মুরারী গুপ্তের কড়চা' বইটা পাওয়া যেত। মুরারী গুপ্ত ও শ্রীচৈতন্য একই গুরুর টোলের ছাত্র ছিলেন। মুরারী গুপ্ত বইটি লিখেছিলেন

শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুর তিন বছরের মধ্যে। অর্থাৎ ১৫৩৩-১৫৩৬ সালের মধ্যে।

সুকৌশলে শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু রহস্য লুকানো ও নথিপত্র নষ্ট করা হয়েছে এমন মত সমস্ত পণ্ডিত ও গবেষক মহলের। শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে যত বই লেখা হয়েছে তা ভালভাবে পড়লে ভাববাদী চৈতন্যের উদ্দেশ্য ঘটলেও জ্ঞান-বিদ্যে — অমানবিক মানসিকতার কোন পরিবর্তন ঘটে না। মহাপ্রভু মহাপ্রভু বলে যতই চোখের জলে ভাসি না কেন, তার অকাল মৃত্যু সত্যতঃ মন বিচ্যুতই মানে না। কিন্তু এদেশের আকাশে-বাতাসে উগ্র হিন্দুত্ববাদ যুক্তি বিজ্ঞান মানে না, মানবিকতা বা মনুষ্যত্বের ধারণা ধরে না। তারা চায়, ধর্মীয় উদ্ভাবনা। 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের বাসা'র প্রকৃত উদাহরণ হল তৎকালীন পুরীর পাণ্ডারা। শ্রীচৈতন্য কি সত্যিই রোমান্টিক কবি শেলির মত বেছে নিয়েছিলেন সমুদ্র মৃত্যু? তাহলে শেলির মত তাঁরও দেহ ফিরিয়ে দেয়নি কেন সমুদ্র? এ প্রশ্ন থেকেই যায়। কেননা, সমুদ্র প্রাণ নিলেও শরীরটা ফেরৎ দেয়। তবে সমুদ্রের ফেরৎ দেওয়া শরীর কেউ গোপন করলে বা কারো চোখে না পড়লে তা আমাদের দৃষ্টিগোচর না হওয়া স্বাভাবিক।

এত প্রশ্ন জাগত না, যদি শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু রহস্যজনক না হত। কয়েকশত বছর ধর্মকে আফিম বানিয়ে শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু রহস্যকে আড়াল করে রাখা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য খুন হয়েছেন ভাবলেও আমাদের সমগ্র শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। তাই এই মমান্তিক ঘটনার জন্য যতটা না দুঃখ হয়, যারা খুন করেছে তাদের প্রতি যতটা না ঘৃণা হয় তার চাইতে বেশি দুঃখ হয় যারা গবেষক, ইতিহাসবিদ, রাষ্ট্র নেতা বা শ্রীচৈতন্যের দর্শনের পূজারী তাদের সেখে। কারণ, এদের সর্বাপ্রায়ে প্রয়োজন ছিল শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটন করা। কেননা, যারা আমাদের পথ দেখিয়েছেন তাঁরা অন্ধকারে খুন হবেন অথচ দোষীরা বহাল তবিয়তে থাকবে তা হয় না। সত্য সর্বদাই সামনে আসা উচিত। যাই হোক, দু-একজন বাদ দিয়ে গোটা পণ্ডিত সমাজ এ ব্যাপারে ধর্মীয় অফিস বা কাপুরুষতার কারণে নির্বোধ বনে গেছেন।

আমরা শ্রীচৈতন্য কেন খুন হলেন সে প্রশ্নে আসি। জয়দেব মুখোপাধ্যায় নামে এক চৈতন্য গবেষক শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধানের ৪৬৮ বছর পরে রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেন। ২২ বছর পুরীতে কাটিয়েছিলেন জয়দেব মুখোপাধ্যায়, পুরনো পুঁথিতে চৈতন্য অন্তর্ধানের কথা খোঁজ করতে করতে তিনি হতবাক হয়ে পড়েন। তাঁর গবেষণার প্রথম ফসল 'কঁহা গেলে তোমা পাই' নামের গ্রন্থ। জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থে যে অন্বেষণ দেখি তা

সত্যিই চমকপ্রদ। যুক্তিবাদী মন নিয়ে গবেষণা করেছেন। গোটা বইটি জুড়ে লেখক একটি সত্যের মুখোমুখি হওয়ার চেষ্টা প্রাণপণে করেছেন। প্রথম বইটি পড়লে বোকা যাবে যে দ্বিতীয় প্রকাশনায় অবশ্যই সত্য উদ্ঘাটিত হবে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাই হল। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডটি বেরোবার আগে জয়দেব মুখোপাধ্যায় খুন হন। কেন খুন হন জয়দেব মুখোপাধ্যায়? কোন সত্যের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি? কারা খুন করে জয়দেবকে? আমাদের এরকম নানান প্রশ্নের সামনে পড়তে হয়। দেখা যাক, জয়দেব দ্বিতীয় খন্ডে কি লিখেছিলেন? তিনি পরিষ্কারভাবে লিখলেন — 'মন্দিরের মধ্যেই চৈতন্যের মৃত্যুর কথা, ঘাতকের হাতে'।

লজ্জায় মাথা নত হয়ে যায়। শিক্ষিত সমাজের, পণ্ডিত সমাজের, এই ছোট সত্যটুকু বলতে পারার অক্ষমতা দেখে। আজ্ঞা, জয়দেব ছাড়া আর কেউ কি বলেছেন একথা? হ্যাঁ, দু-একজন শ্রীচৈতন্যের খুন হওয়ার কথা বলেছেন। এছাড়া সাম্প্রতিক কালের অনেকের মধ্যে অন্যতম দীনেশচন্দ্র সেন, নীহাররঞ্জন রায়, ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার প্রমুখ সমাজ-বিজ্ঞানী ও গবেষকগণ জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একমত।

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থে বলেছেন, 'পুরীর পাণ্ডাদের মধ্যে আর একটি ভীষণ প্রবাদ প্রচলিত আছে - তাহা আমি তথায় শুনিয়াছি। জগন্নাথ বিগ্রহ হইতেও চৈতন্যের প্রতিপত্তি বেশি হওয়াতে পাণ্ডারা নাকি গোপনে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল।

কবি বৈষ্ণবচরণ তাঁর চৈতন্য কড়চা'র বলেছেন — চৈতন্য দেবের মৃতদেহ রাত্রি ১০ দণ্ডের সময় গরুড় স্তম্ভের পিছনে পড়েছিল, তারপর সেই মৃতদেহকে গোপীনাথের মন্দিরে কানাই খুটিয়া ও শিখি মাহাতি এনেছিলেন।

চৈতন্যকে আঘাত করা হয় রাজনৈতিক কারণে।

'বুড়া লেংকা যাই বালি নবার প্রবেশিল/
রাজ আজ্ঞা ছামুয়ে এ কথা নিবেদিল/
আজ্ঞাদিল বিলোপিনো রাজা শ্রীঅঙ্গুক/
সর্বো নাম রতন ঘোষ সমাধি করিল'।

অর্থাৎ বুড়া লেংকা শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুর সংবাদ বালিসাই রাজপ্রাসাদের রাজার কাছে গিয়ে নিবেদন করলেন। তখন শোকে রাজা বিলাপ করতে করতে আদেশ দিলেন যেন প্রভুর শ্রীঅঙ্গকে রতন ঘোষের তত্ত্ববধানে সমাধিস্থ করা হয়। প্রশ্ন জাগে রাজা কেন এমন

আদেশ দিয়েছিলেন? বৈষ্ণব চরণদাসের 'চৈতন্যকরচ্য'র এই প্রশ্নের উত্তর "সম্ভবত চাপে পড়ে"। বৈষ্ণবচরণ চৈতন্য মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শী। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে দুটি সূত্র স্পষ্ট।

প্রথমত, বৈষ্ণবচরণ দাস শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শী।

দ্বিতীয়ত, রাজা প্রতাপরুদ্রদেব, সম্ভবত চাপে পড়ে শ্রীচৈতন্যকে খুন করার কথা চোপে গিয়ে রতন ঘোষের নেতৃত্বে সমাধিস্থ করতে বলেন।

প্রশ্ন জাগে কী সেই চাপ? কেনই বা তারা শ্রীচৈতন্যকে হত্যার জন্য রাজার ওপর চাপ সৃষ্টি করল? শ্রীচৈতন্য এমন কী করেছিলেন যার জন্য তাঁকে খুন হতে হল?

এ প্রসঙ্গে ওড়িয়ার ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্মই ওড়িয়ার পতনের প্রধান কারণ। কেননা, রাজা প্রতাপরুদ্র ও তাঁর সূদক্ষ মন্ত্রী রামানন্দ রায় দুজনেই শ্রীচৈতন্যের একান্ত ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। অনেক পণ্ডিতই মনে করেন, গোপী প্রেমে মাতোয়ারা হলে, দেশ যে রসাতলে যাবে, তাতে আর অবাধ হওয়ার কিছু নেই। তবে চৈতন্য-বিরোধী চক্রের খুব সুবিধা হয়েছিল, চৈতন্য অনুগামীদের দিয়ে বৌদ্ধদের প্রতি অবিচার করাতে পেরে। ঘটনাটি নিম্নরূপ —

একদা পুরীর জগন্নাথ মন্দির ছিল বৌদ্ধ মন্দির। রামপ্রসাদের গান আছে -

'পুণ তা ভ্যাজিয়া বুদ্ধ মুরতি তিন/
জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা তাহাতে তিন।'

এই বুদ্ধ মন্দিরকে ব্রাহ্মণেরা দখল করে হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত করেন। চৈতন্যদেব ও রায় রামানন্দ মূলতঃ এই সময়ে যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তা ছিল প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম। ওড়িয়ার পঞ্চসখা বলতে জগন্নাথ দাস, অচ্যুতানন্দ, অনন্ত ও যশোবন্ত দাসকেই বোঝায়। বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী এই পঞ্চসখার সঙ্গে চৈতন্য মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের অন্যতম মহিষী রানী পদ্মাবতী বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। 'সরস্বতী বিলাস' গ্রন্থে উল্লেখ আছে — বীরসিংহ নামক এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রভাব রানী পদ্মাবতীর উপর ছিল অত্যধিক। 'বৌদ্ধধর্ম বড় না হিন্দুধর্ম বড়' এই নিয়ে গুরু হল তর্ক ও বিচার। এই বিচার সভার আহ্বায়ক ছিলেন স্বয়ং মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শঠতার আশ্রয় নিয়ে একটি পাত্রে একটি সাপকে লুকিয়ে রেখে অদৃশ্য করে দিলেন। যুক্তিবাদী বৌদ্ধদের বোকা বানিয়ে তর্ক যুদ্ধে জয়লাভ করলেন ব্রাহ্মণগণ।

এই ছলনার জন্য চৈতন্য বিরোধী চক্র দারী করলেন শ্রীচৈতন্যকে। ফলে, যে ভালোবাসা ও বিশ্বাস শ্রীচৈতন্যের প্রতি বৌদ্ধদের ছিল, তা কমতে শুরু করে। অন্যদিকে শ্রীচৈতন্যের শত্রুপক্ষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু কেন এই তৎপরতা?

গৌড়ের অধিপতি হুশেন শাহের ডান হাত ও বাম হাত ছিলেন রূপ-সনাতন দুই হিন্দু মন্ত্রী। সনাতনকে সাকর মন্দির উপাধিতে ভূষিত করেন হুশেন শাহ। কোতোয়াল থেকে যুদ্ধমন্ত্রী ও পরে উজির পদে উত্তীর্ণ হন সাকর মন্দির।

হিন্দু হয়ে হিন্দুদের প্রতি পৈশাচিক তাণ্ডব করায় ভিতরে ভিতরে দক্ষ হচ্ছিলেন সাকর মন্দির। বিধর্মী রাজা হুশেন শাহের দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ খুঁজছিলেন সাকর মন্দির।

শ্রীচৈতন্যের নিহত হওয়ার অলক্ষ্যে ছিল রাজনীতি, রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের এক গোপন পরামর্শ হয়েছিল। প্রতাপরুদ্রদেব বুঝতে পেরেছিলেন, রূপ আর সাকর মন্দিরকে সরাসরে না পারলে হুশেন শাহ'র বিষদাঁত ভাঙা যাবে না। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন শ্রীচৈতন্যের দূরদৃষ্টি ছিল অসাধারণ। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় হুশেন শাহ যখন গৌড়ের সিংহাসনে, দিল্লির সিংহাসনে তখন সিকন্দর লোদী। দু'জনেই হিন্দু বিদ্বেষী ও অত্যাচারী। বাংলা-বিহার-ওড়িয়া ও গৌড়ের হিন্দু মঠ-মন্দির ধ্বংস, নারী নির্যাতন যেমন হুশেন শাহ করেছেন, তেমনি দিল্লির মসনদে বসে সিকন্দর লোদী বৃন্দাবন-কাশীর মঠ-মন্দির ধ্বংস করেছেন। শেষ পর্যন্ত শ্রীচৈতন্য শ্রীরূপ ও সাকর মন্দিরকে হুশেন শাহ'র মন্ত্রিত্ব ছাড়িয়ে ধর্ম আন্দোলনের পথে আনেন। রূপ গোস্থামী ও সনাতন গোস্থামী রূপে বৈষ্ণব সমাজে তাঁরা সমাদৃত হন। গোবিন্দ বিদ্যাবতীর রাজা হওয়ার স্বপ্নে বাধার সৃষ্টি করেছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র একদিকে যেমন ঘরে বাইরে শত্রুর জ্বালায় জর্জরিত হচ্ছিলেন তেমনি শ্রীচৈতন্যের প্রচেষ্টায়, রূপ-সনাতনদের সহযোগিতায় শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন।

এবার আমরা দেখব লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' কী বলে? যদি আমরা প্রশ্ন করি, জগন্নাথ মন্দিরের দরজা বন্ধ করে কি ঘাতকের দল চৈতন্যকে আঘাত করে? লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ উত্তর হল — "তখন দুরারে নিজে লাগির কপাট/সত্ত্ব চলিয়া গেল প্রস্তরে উছাট।" মন্দিরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে বুক কাঁপল। আঘাত পাওয়ার পর শ্রীচৈতন্য কী করলেন — "তখন পড়িয়া প্রভুর অঙ্গ স্তম্ভ পাছ আড়ে/কান্দিল বৈষ্ণবগণ

কুহারে কুহারে।” আঘাত পেয়ে শ্রীচৈতন্য কি গভীর স্তম্ভের কাছে পড়ে গেলেন? বৈষ্ণবচরণদাসের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ শুধু নয় গবেষক জয়দেব মুখোপাধ্যায় এমন কি সাম্প্রতিক কালের সমাজের গবেষক দীনেশচন্দ্র সেন, নীহার রঞ্জন রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণের অভিমত শ্রীচৈতন্যকে হত্যা করা হয়েছিল। এখনো পর্যন্ত আমরা যা দেখলাম তাতে সেই হত্যালীলা অত্যন্ত পৈশাচিকও বটে।

সকল চৈতন্য জীবনীকার ও গবেষকগণ লিখেছেন পুরীতে চৈতন্যের প্রভাব বাড়ার পাশাপাশি শত্রুও বাড়ছিল। কিন্তু কেন? কারণ, ওড়িশার রাজা প্রতাপচন্দ্র রুদ্র ক্রমশঃই বশ্য হয়েছিলেন চৈতন্যের অনন্য মেধার, প্রগাঢ় প্রজ্ঞার, অসামান্য ব্যক্তিত্বের। রাজনৈতিক ক্ষমতার বিপজ্জনক নৈকট্যে চলে এসেছিলেন চৈতন্য। রাজার উপর তাঁর প্রভাব শত্রুবৃদ্ধির মূল কারণ, রাজকর্মচারী, রাজার নিকট আত্মীয় সহ গোড়া ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁর শত্রু হয়েছিল। এদের মধ্যে প্রধান শত্রু: মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধর।

তাহলে শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুর অন্যতম কারণ রাজরোষ। শুধু কৃষ্ণপ্রেম নয়। রাজনৈতিক কারণ। গোবিন্দ বিদ্যাধর মন্ত্রী হলেও রাজক্ষমতা ভোগ করতেন। রাজার নামে তিনিই মূলতঃ প্রজা শাসন ও শোষণ করতেন। শ্রীচৈতন্যের প্রচেষ্টায় রাজার জ্ঞানচক্ষু খুলে যেতে থাকে। ফলে ক্রমশঃ গোবিন্দ বিদ্যাধরের প্রজা অত্যাচার রাজার চোখে জলের মত পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তবে, এতদিনে রাজা প্রতাপচন্দ্র রুদ্র বড় অসহায় হয়ে পড়েছেন। বড় বড় আমলা, মন্ত্রী, ধনাঢ্য শ্রেণিকে গোবিন্দ বিদ্যাধর বশ করে ফেলেছেন।

শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুর প্রধানতম কারণ রাজনৈতিক হলেও বিপিনচন্দ্র পালের মতে শ্রীচৈতন্যের শত্রুবৃদ্ধির আরও কারণ আছে। যথা— “ব্রাহ্মণ, বৈদ্য তথাকথিত উচ্চবর্ণের দৃষ্টিতে যারা ‘কায়স্থ শূদ্র’ এবং ‘জল-চল’ যাদের রক্তা খেলে জাত যায়, সেইসব অত্রাহ্মণদের মধ্যে থেকেও বহু জ্ঞানী-গুণীকে তিনি এই নব বৈষ্ণব সমাজে এনে উঁচু আসন দিতে লাগলেন। এই বৈষ্ণব ধর্ম-আন্দোলনে যেসব সন্তান যোগ দিলেন, তাঁদের পাশাপাশি এঁরাও সমমর্যাদায় গুরু আসনে অধিষ্ঠিত হলেন। তাদের সকলকেই বলা হত ‘গোস্থানী’। এ-যাবৎ ব্রাহ্মণ গুরু যে সামাজিক মর্যাদা পেতেন, এখন অত্রাহ্মণ গুরুরাও শিষ্যদের নিকটে সেই মান-মর্যাদা লাভ করলেন। উপরন্তু হরিদাসের মতো, মুসলমান সন্তরাও ব্রাহ্মণের সমান মান্য হলেন। আবার যেসব হিন্দু-মুসলমান রাজদরবারের সংস্পর্শে পতিত হয়েছিলেন, তাঁরা বৈষ্ণবচার্য গ্রহণ করে সামাজিক মর্যাদা ফিরে পেতে লাগলেন এবং বৈষ্ণব সমাজের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁদের গুরুত্ব স্বীকৃত হল। তৎকালীন বঙ্গ নবজাগরণের

এই বিপজ্জনক পুরুষকে বাঁচতে দেওয়া যায়? ব্রাহ্মণ্যবাদী মানসিকতায় বাঁচতে দেওয়া যায় না। ভারতীয় উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা তাই শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্মকে হিন্দুধর্ম হিসাবে মনে করেন না। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা হিন্দুধর্মের পরিপন্থী বলে মনে করেন। যদিও সারাজীবন শ্রীচৈতন্য হিন্দুত্ববাদীদের হয়ে কাজ করে গেলেন তথাপি তাদের মন পেলেন না। শত্রুতে পরিণত হলেন। মৃত্যুর কারণ রহস্যাবৃত রইল। অসহায় সহজ সরল মানুষ চোখের জলে বুক ভাসালেন। বড় বড় মন্দির হল, জীবনী লেখা হল, কাতারে কাতারে মানুষ বৈষ্ণব হল। ধর্মীয় অন্ধত্ব গ্রাস করল সত্যকে। ভেকধারী বৈষ্ণবে ভরে গেল গোটা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা।

তবে চৈতন্য মহাপ্রভুর মৃত্যু রহস্যের আর একটি নতুন দিক হল তাঁর মরসেহ লোপাট। আর এই চৈতন্যের অন্তর্ধান একটি ‘হলিউড’ চিত্রনাট্যের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। ১৯৮০-তে প্রকাশিত প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের ‘চৈতন্যমটক’ যেখানে মন্দিরের তলায় একটি পথের কথা বলা হয়েছে, যেখান দিয়ে চৈতন্যের মরসেহ নিয়ে গিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এ কথার আরও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ — ‘শ্রীমহাভাব প্রকাশ’ গ্রন্থে ফকিরমোহন দাসও পুরীর মন্দিরের তলায় একটি স্তম্ভ পথের উল্লেখ করেছেন। মুসলমান আক্রমণের সময়ে নাকি মন্দিরের দক্ষিণ দুরারের পার্শ্ববর্তী গুপ্তপথ দিয়েই দেববিগ্রহ সরিয়ে রাখা হয়েছিল চিন্তার গোপন পর্বত গুহায়। এই পথ দিয়েই চৈতন্যের মরসেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয় প্রাচীন নদীতে। সেই কারণেই সম্ভবত পুরীতে তাঁর কোন সমাধি নেই। কিন্তু কেন এই গোপনীয়তা? তবে কি শ্রীচৈতন্য খুন হয়েছিলেন! নাকি তিনি গুরু পক্ষের রাগে সমুদ্রকে কৃষ্ণ বলে ভুল করে ভাবাবেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন? তাঁর দেহের কোথাও সন্ধান মেলেনি।

শ্রীচৈতন্য পুরীর মন্দিরে জগন্নাথকে জড়িয়ে ধরে সেই মূর্তির মধ্যে বিলীন হয়ে যান। এই সবাধিক প্রচার বিশ্বাসযোগ্য নয়। কোনও অবস্থাতেই একটা ছ’ফুট লম্বা মানুষ একটা কাঠের মূর্তির সঙ্গে মিশে যেতে পারেন না। আর সবার অলক্ষ্যে শ্রীচৈতন্য সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়ে মরতে পারেন না। সর্বদাই যখন কেউ না কেউ তাঁকে দেখভাল করতেন তখন সকলের চোখের অন্তরালে গিয়ে জলে ডুবে মরবেন একথা কোনও যুক্তিবাদী মানুষ বিশ্বাস করবেন না। তবে কি খুন করে তাঁর শরীর গুম করা হয়? এই যে, চৈতন্যের মৃত্যুরহস্য কয়েকশত বৎসর ধরে একদল শিক্ষিত রাজনৈতিক শক্তিসম্পন্ন মানুষ গোপন করে রাখছে তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য, তাদের স্বার্থ কী? অলৌকিকতায় বিশ্বাসী,

স্বার্থপর-অলস একশ্রেণির মানুষ, যারা নিজেদের 'দেবতাদের জাতি' বলে মনে করে, বর্ণ-অহং যাদের শিরায় শিরায়, ভগবানের অলৌকিক কাহিনী প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ তাদের পেশা। তারা প্রাণপণ চেষ্টা করেন যাতে সাধারণ মানুষ কোনও অবস্থাতেই যেন বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী না হতে পারে। কারণ দেখা গেছে, শিক্ষিত মানুষ যুক্তি-বিজ্ঞানহীন ধর্মীয় ভক্তিতে কম বিশ্বাস করে।

সু-শিক্ষিত এবং স্ব-শিক্ষিত মানুষ মাত্রই সত্ত্বার পূজারি হয়। সত্য পথই অবলম্বন করে। তারা জানে গলায় পৈতে আর মাথায় টিকি রাখলেই 'ঈশ্বর' বা 'ভগবানের' সঙ্গে যোগ থাকবে, তার কোনও মানে নেই। বরং পৈতে আর টিকি হল জঘন্য জাতিভেদের জ্বলন্ত উদাহরণ। তারা এও জানেন, সত্ত্বার পৈতের প্রচলন বেশিদিনের নয়। কেননা, সত্ত্বা আবিষ্কার বেশিদিনের নয়। সত্ত্বার আগে তারা কি পরত?

কয়েকজন গবেষকের কথায় আসা যাক। মূর্তির মধ্যে বিলীন হওয়ার ঘটনাটি ঘটে নাকি বিকল তিনটেতে। লোচন দাসের খবর, গুপ্তিচা বাড়িতে চৈতন্য জগন্নাথে বিলীন হয়েছিলেন। কেউ সে দৃশ্য দেখেনি, কারণ তখন গুপ্তিচা বাড়ির দরজা বন্ধ ছিল। কেউ কেউ আবার বলেন, চৈতন্য মারা গিয়েছিলেন পায়ে ইট ফুটে সেপটিক হয়ে। জয়ানন্দ লিখেছেন, 'আষাঢ়ের শেষে রথযাত্রার নৃত্যকালে চৈতন্যের পায়ে ইটের আঘাত লাগে'। 'ইটালি বাজিল' টিক একই রকম দীপ্তি ত্রিপাঠির বিশ্বাস: "পাথরে ঘা লেগে চৈতন্যের পায়ে একটা ঘা হয়েছিল। পরিচর্যার অভাবে সেটি বিধিয়ে ওঠে।"

প্রশ্ন জাগে, চৈতন্যদেবের মত একজন ধর্মসংস্কারক মানুষের পরিচর্যার অভাব ঘটে কেন? তাঁর জীবনকালেই শত শত মানুষ তাঁকে অনুসরণ করতে শুরু করেছে। যার শতাধিক পারিষদবর্গ, তাঁর অসুস্থতার সেবা কেউ করতেন না এ বিশ্বাস করা কঠিন। তবে যারা সেবা করতেন তাঁরা সকলে রাজার মত অসহায় ছিলেন না তো? যাইহোক, শ্রীচৈতন্য নাচতে নাচতে ও কীর্তন গাইতে গাইতে বৈকলিক স্নানের পর মন্দিরে যান। তাকিয়ে দেখলেন মন্দিরের দরজা প্রথম দিনের মত খোলা। শ্রীচৈতন্য তখন ছুটে গিয়ে জগন্নাথকে আলিঙ্গন করার চেষ্টা করলেন। অমনি ছড়িদারেরা প্রথমদিনের মতই তাঁকে মারতে লাগলেন। আর তো বাসুদেব সার্বভৌম ছিলেন না যে চৈতন্যকে রক্ষা করতেন?

মাধব প্রভৃতি ওড়িয়া ভক্তরা তাঁকে উদ্ধার করে পুনরায় নাটমণ্ডপে শুইয়ে দিলেন। তখন তাঁর সারা দেহ কেটে গিয়েছে। ভাবতে সংশয় লাগে, চৈতন্যদেবকে ছড়িদারেরা লাঠি দিয়ে পেটালেন। তবে কি চৈতন্যদেব পাগল বা উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন? যাইহোক

না কেন, যখন সেখি শত শত মানুষ তাঁর মত ও পথ গ্রহণ করেছে, রাজা-মহারাজা, জ্ঞানী-পণ্ডিতেরা যখন তাঁর সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হচ্ছেন, তাঁকে নিয়ে বই লেখা হল, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার জল-চল, কোন কোন ক্ষেত্রে জল-অচল সম্প্রদায়ের মানুষজন তাঁকে অনুসরণ করে মুসলিম না হয়ে বৈষ্ণব হচ্ছিল তখন তাঁর মত মানুষকে একদল ধর্মীয় গোঁড়া মানুষের চক্রান্তের শিকার হয়ে অমানবিক কষ্ট পেতে হল। তাহলে আমাদের কাছে স্পষ্ট যে,

- (১) জগন্নাথে বিলীন হওয়া,
- (২) বিনা চিকিৎসায় সেপটিক হয়ে মরে যাওয়া,
- (৩) সমুদ্রের জলে ডুবে মরা,
- (৪) পাগল বা উন্মাদ আখ্যা দিয়ে অনামবিক অত্যাচার করা,
- (৫) ছড়িদার কর্তৃক নিয়মিত লাঠিপেটা।

এইসব শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে করা হয়েছে। সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয়, এতদিন হয়ে গেল কোনওভাবেই শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটন করা গেল না। কিংবা ভারতীয় পণ্ডিত সমাজ নিজেদের যত বড় পণ্ডিত ভাবুন না কেন, শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু রহস্য কোনওদিনই উদ্ঘাটন করতে পারবেন না। কেন পারবেন না? প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন হলে এসেশের তাবড় তাবড় ভক্ত এবং গবেষকগণ যে ভণ্ড হিসেবে ধরা পড়বে!

ছড়িদারদের হাতে মার খেয়ে শ্রীচৈতন্য অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর জ্ঞান ফিরল বটে কিন্তু তাঁর তখন প্রচণ্ড জ্বর। তখন ভক্তরা চৈতন্য মহাপ্রভুর মুখে চরণামৃত ও মাথায় জল ছিটিয়ে দিতে লাগলেন। কিন্তু লক্ষ করুন, কোন বাঙালি ভক্তকে খবর দেওয়া হল না। কাশী মিশ্রের বাড়িতে তখনও রঘুনাথ গোস্বামী ও তাঁর অনুচর কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছিলেন। ভক্ত গোবিন্দ যিনি ঈশ্বরপুরীরও শেষ সেবা করেছিলেন, তাঁকেও ভাঙ্গা হয়নি। রাতে জ্বর যখন ক্রমশঃ বাড়তে লাগল তখন রায় রামানন্দকে খবর পাঠানো হল। রায় রামানন্দ এসেই মন্দিরের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিতে বললেন এবং রাজাকে খবর পাঠালেন। রাজাকে দেখেই রামানন্দ বললেন, চৈতন্যের দেহ মন্দিরের বাইরে নিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক। একটা দাসী হতে পারে।

সাবাস! সাবাস! সাবাস চৈতন্যপ্রেমী ভারতবাসী! বিপদকালে আপন মানুষ কাউকে

ডাকা হল না। কিন্তু কেন? কি এমন ঘটনা ঘটেছিল যে, শ্রীচৈতন্যের মরসেহ মন্দিরের বাইরে নিয়ে গেলে নিপদ ঘটবে? প্রকাশ্যে মরসেহ নেওয়ার চাইতে জগন্নাথ মূর্তিতে বিলীন হয়ে যাওয়ার গল্প অঙ্কভক্তদের কাছে বেশি বিশ্বাসযোগ্য। এক টিলে দুই পাখির মৃত্যুর মত, একদিকে চৈতন্যের হত্যাকারীরা নিষ্কৃতি পেল, তেমনি অন্যদিকে, জগন্নাথ মূর্তিতে বিলীন হওয়াকে অলৌকিক শক্তির বলে প্রচার করা গেল।

শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুর পর রাজা প্রতাপচন্দ্রের কী হল? তিনিও খুন হন। একটু খুলে বলি। ঐতিহাসিকদের মতে, রাজা প্রতাপরুদ্রদেব ১৮৯৭-১৫৪০ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। প্রতাপরুদ্রদেবের পর তাঁর পুত্র কালুয়াদেব সিংহাসনে বসেন। তিনি এক বৎসর পাঁচ মাস তিন দিন রাজত্ব করার পর গোবিন্দ বিদ্যাধর কর্তৃক নিহত হন। ১৫৪১ সালে প্রতাপরুদ্রদেবের অপর পুত্র দেব আবার গোবিন্দ বিদ্যাধর কর্তৃক উৎকলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এক বৎসর পর তিনিও নিহত হন।

১৫৪২ সালে গোবিন্দ বিদ্যাধর উৎকলের সিংহাসনে বসেন। শ্রীচৈতন্যের শেষ কয়েক ঘণ্টার সাক্ষী রামানন্দ। তাঁর কী হল? তাঁরও মৃত্যু রহস্যজনক। সম্ভবত খুন। গদাধর পণ্ডিত? খুন হন। কাশী মিশ্র? মুছে গেলেন অকস্মাৎ। চৈতন্য মহাপ্রভু যে রাত্রে দেহ রাখলেন সে রাত্রে কাশী মিশ্রের বাড়িতে যারা ছিলেন সেই রথুনাথ গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিশ্চয়ই চৈতন্যের মৃত্যু সংবাদ পেয়েই ছুটে এসেছিলেন? না, তারা রাতের অন্ধকারেই পালিয়েছিলেন। নিজেদের জিনিসপত্র, চৈতন্যের দেওয়া বহিঃ হাত তুলসীর মালা, শালগ্রামশীলা সঙ্গে নিয়ে। কোথায় পালালেন? বাড়িখন্ডের পথে, বৃন্দাবনের দিকে, চৈতন্যের তিরোধান সংবাদ পেয়ে নিত্যানন্দ কি একবারও পুরীতে এসেছিলেন? না, কেউই আসেন নি। বাঙালি ভক্তরা পুরীর বদলে যেতে লাগলেন বৃন্দাবনে। এরপরও আমরা গর্ব করে বলব, শ্রীচৈতন্য খুন হননি, অন্তর্ধান হয়েছেন। কি বিচিত্র এই দেশ।



নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন, ২০০৩-পূর্ববঙ্গের উদ্ধাত্তদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার দলিল
কৌশিক ভারত

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু স্বাধীনতা ঘোষণা অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, “আমরা সেইসব ভাইবোনদের কথা ভাবছি, যাদের একটা রাজনৈতিক সীমারেখার দ্বারা আমাদের থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে এবং যারা ভারতব্রাহ্ম হৃদয়ে স্বাধীনতার স্বাদ আবাদন করতে পারছেন না। তবে যাই ঘটুক না কেন, তাঁরা আমাদেরই একজন এবং ভবিষ্যতে আমাদেরই একজন হয়ে থাকবেন। ভাল বা মন্দ, যাই হোক না কেন, সবকিছুতেই আমরা তাদের সমান ভাগীদার হয়ে থাকবো”।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সালে এক প্রার্থনা সভায় বলেন, “যে সমস্ত শিখ ও হিন্দুরা পাকিস্তানে আছেন, তারা যদি সেখানে থাকতে না চান, তাহলে যে কোনও সময়ে, যে কোনওভাবে ভারতে চলে আসতে পারেন। সে ক্ষেত্রে ভারত সরকারের প্রথম কাজ হল তাদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করা এবং সুখ-স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা”।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল ১৫ই জানুয়ারী ১৯৫০ সালে বলেন, “পূর্ববঙ্গের হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘু মানুষেরা আমাদের রক্তমাংসের সমান, যারা স্বাধীনতার জন্য আমাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছেন। তারা একটা সীমারেখার ওপারে পড়েছেন বলে হঠাৎই বিদেশী বলে গণ্য হতে পারেন না। এদেশের উপর তাঁদেরও অধিকার রয়েছে”।

উদ্ধৃতিগুলি একথাটাই প্রমাণ করে যে, ১৯৪৭-এর আশেপাশে পশ্চিম বা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তত সংখ্যালঘু মানুষের প্রতি ভারতরাত্ত্রের কর্তৃদ্বারা একটা দায়বদ্ধতা অনুভব করতেন। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী গৃহীত ভারতীয় সংবিধানের ২য় খণ্ডে ৫নং ধারা থেকে ১১ নং ধারার মধ্যে নাগরিকত্ব সম্পর্কীয় নির্দেশ জারি করা হয়। এর মধ্যে ৫নং ধারা থেকে ৯নং ধারার মধ্যে বলে দেওয়া আছে সংবিধান গ্রহণের দিন কাদের মূল ভারতীয় হিসাবে গণ্য করা হলো। ১০নং ধারায় বলা হয়েছে যে, যারা ভারতীয় হিসাবে গণ্য হলেন, সাধারণভাবে তাঁরা ভারতীয় নাগরিক হিসাবেই বহাল থাকবেন।

১১নং ধারায় নাগরিকত্ব সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সংশোধন ও আইন তৈরী করার অধিকার দেওয়া হয়েছে পার্লামেন্টকে।

এনং ধারায় বলা হয়েছে — যারা ভারত ভূখণ্ডে বসবাস করছেন এবং

- (ক) যারা ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন অথবা
- (খ) যার মা এবং বাবার মধ্যে অন্তত একজন ভারত ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন, অথবা
- (গ) যে বা যারা ভারতের সংবিধান গ্রহণের দিনের আগে ৫ বছর ধরে ভারতে বসবাস করছেন — তাঁরা ভারতীয় সংবিধান গ্রহণের দিন থেকে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গণ্য হবেন।

৬ নং ধারায় বলা হয়েছে — একজন ব্যক্তি যিনি বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত এলাকা থেকে দেশান্তরিত হয়ে ভারত ভূখণ্ডে এসেছেন, তাঁকে সংবিধান গ্রহণের দিন ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হবে যদি তিনি বা তাঁর মা-বাবার মধ্যে করণ ও অন্ততঃ একজন বা তাঁর ঠাকুর-ঠাকুরমার মধ্যে একজন অবিভক্ত ভারতের (১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বর্ণিত ভারত) মাটিতে জন্মগ্রহণ করে থাকেন এবং

- (ক) তিনি যদি দেশান্তরিত হয়ে ১৯ জুলাই, ১৯৪৮ সালের আগে ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন,
- (খ) ১৯ জুলাই ১৯৪৮ বা তার পরে ভারতে এসেছেন, কিন্তু তিনি যদি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নাগরিক হিসাবে নিজের নাম নথিভুক্ত করে থাকেন। (নাম নথিভুক্ত করতে হলে, তাকে অন্তত ৬ মাস ভারতে বসবাস করার প্রমাণ দর্শাতে হবে এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ভারত সরকার নিযুক্ত আধিকারিক দ্বারা বা বর্তমান সংবিধানের অধীনে সরকার কর্তৃক একজন নাগরিক রূপে নিবন্ধিত হন।)

সংবিধানের ১১নং ধারা অনুসারে প্রথমে ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫ পাশ হয় ৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৫। তারপর ৮ বার এই আইনের সংশোধন করা হয়েছে। ১৯৫৭, ১৯৬০, ১৯৮৫, ১৯৮৬, ১৯৯২, ২০০৩ এবং ২০০৪। এর মধ্যে সংশোধনী ১৯৮৬ ও সংশোধনী ২০০৩ উদ্বাস্তু মানুষের নাগরিকত্ব পাবার ক্ষেত্রে খুবই ক্ষতিকারক।

১৯৮৬ সালের সংশোধনী কার্যকরী হয় ১৯৮৭ সালের ১ জুলাই থেকে। এতে বলা হয় ১৯৮৭ সালের ১ জুলাই থেকে শুধু ভারতে জন্মগ্রহণ করলেই জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পাওয়া যাবে না, জন্মসূত্রে নাগরিক হতে গেলে তার বাবা অথবা মায়ের মধ্যে একজনকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে।

২০০৩ সালে এন.ডি.এ. সরকার যখন সংশোধনী আনে তখন তারা বলে অনুপ্রবেশকারীরা দেশের জনভারসাম্য নষ্ট করে দিচ্ছে। অথচ ১৯৯২-৯৩ সালে টাটা সার্ভিস লিমিটেড তাদের সমীক্ষা প্রতিবেদনে জানায় ১ কোটি ২৭ লক্ষ মানুষ ভারত ছেড়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চলে গেছে। সুতরাং যদি ১ কোটি ৮০ লক্ষ বেআইনী অনুপ্রবেশ ঘটেও থাকে তাহলে বাড়তি মানুষের সংখ্যাটা দাঁড়ায় ৫৩ লক্ষের কাছাকাছি। ১২০ কোটির দেশে ৫৩ লক্ষ মানুষই তাহলে দেশের জনসমষ্টির ভারসাম্য নষ্ট করে দিচ্ছে বলে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। যাই হোক ২০০৩ সালের সংশোধনীতে বলা হল (ধারা ৩/সি) কোন শিশুকে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পেতে হলে তার মা এবং বাবা দুজনকেই ভারতীয় বৈধ নাগরিক হতে হবে। ৩ ডিসেম্বর, ২০০৪ সাল থেকে এই আইন কার্যকরী করা হয়। এই আইনের ধারা ২(i) (b) তে দেওয়া হয়েছে অনুপ্রবেশকারী বা বেআইনী অভিবাসীর সংজ্ঞা। বলা হয়েছে —

- (ক) কোনও বিদেশী, যিনি বৈধ পাসপোর্ট বা সমতুল কোনও অনুমতিপত্র ছাড়া ভারতে ঢুকেছেন, তিনি অনুপ্রবেশকারী।
- (খ) বৈধ পাসপোর্ট বা সমতুল অনুমতিপত্র সহ ভারতে ঢুকেছেন, কিন্তু ভিসা বা অনুমতির সময়সীমা পেরিয়ে যাবার পরেও ভারতে থেকে গেছেন — তারা অনুপ্রবেশকারী। এবং এইসব অনুপ্রবেশকারীরা কোনওভাবেই ভারতের নাগরিকত্ব পাবেন না।

উল্লেখযোগ্য হল এই অনুপ্রবেশকারীর সংজ্ঞায় কোনও তারিখ নেই। নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন, ২০০৩-এ আসাম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,

ধারা ৬এ(২) — ভারতীয় বংশোদ্ভূত যে সমস্ত মানুষ পূর্ব পাকিস্তান থেকে বা এখনকার বাংলাদেশ থেকে ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারী আগের দিন পর্যন্ত আসামে এসেছেন এবং যাদের নাম ১৯৬৭ সালের লোকসভা নির্বাচনের জন্য তৈরী ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং যারা সাধারণভাবে আসামে বসবাস করছেন তাদের ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারী থেকে ভারতীয় হিসাবে গণ্য করা হবে।

ধারা ৬এ(৩)—ভারতীয় বংশোদ্ভূত যেসব মানুষ পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ ভূখণ্ড হতে আসামে এসেছেন ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারী থেকে ১৯৭১, ২৫ মার্চের মধ্যে এবং যারা সাধারণভাবে আসামের বাসিন্দা এবং যারা ১৯৪৬ সালের বিদেশী আইন ও ১৯৬৪ সালের বিদেশী বিচার নির্দেশ অনুযায়ী বিদেশী হিসাবে সনাক্ত হয়েছেন তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে কেটে দেওয়া হবে কিন্তু এই উদ্ধাস্তরা ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

ধারা ৬এ(৪)—এভাবে যাবা বিদেশী বলে সনাক্ত হলেন এবং নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করলেন তাদের নাম বিদেশী হিসাবে সনাক্ত হবার দিন থেকে ১০ বছর ভোটার তালিকায় উঠবে না।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, ২০০৩ যখন ১৮ ডিসেম্বর রাজ্যসভায় পেশ হয় তখন ডঃ মনমোহন সিংহ (রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা) জানান, “বাংলাদেশের সংখ্যালঘু মানুষেরা ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত। এই সব হতভাগ্য মানুষেরা যদি আমাদের দেশে আশ্রয় চান এবং নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেন, তাহলে তাদের নাগরিকত্ব দেবার বিষয়টি আমাদের উদার চিন্তে দেখতে হবে। আশাকরি, নাগরিকত্ব আইনটি চূড়ান্ত করার সময় উপ-প্রধানমন্ত্রী (লালকৃষ্ণ আডবানী) এ বিষয় মনে রাখবেন”। লোকসভায় বিলটি পেশ করে বিজেপি-তৃণমূল প্রকৃতির জোট এন.ডি.এ. এবং বি.জে.পি.র যুক্তি ছিল বাংলাদেশ থেকে মুসলিম অনুপ্রবেশরোধ।

এই সংশোধনী আইন লোকসভায় ধনিভোটে পাশ হয়েছিল কোনরকম আলোচনা ছাড়াই আর রাজ্যসভায় ডঃ মনমোহন সিংহ ও শঙ্কর রায়চৌধুরী-র আলোচনা সাপেক্ষে সর্বসম্মতভাবে বিলটি পাশ হয়। অর্থাৎ সংসদের অংশীদার সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি সম্মিলিতভাবে এই বাঙালী উদ্ধাস্তদের মৃত্যুসনদে শিলমোহর দেয়। রাজ্যসভায় জবাবী ভাষণে লালকৃষ্ণ আডবানী পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে আগত সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্বদানের বিষয়ে সহমতের কথা জানালেও আইনে কিন্তু সেই সংক্ৰান্ত কোনও বিধান রাখা হয়নি।

রিপাবলিকান পার্টির রাজ্যসভা সাংসদ অর.এস. গভাই অনুপ্রবেশকারীর সংজ্ঞা সংক্ৰান্ত বিষয়ে স্পেশাল মেনশন উত্থাপন করেন ৭ ডিসেম্বর, ২০০৪। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিল লিখিতভাবে এই সংক্ৰান্ত যে উত্তর দেন তার মূল কথা — “আমি বিষয়টি মনোযোগ দিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি। ২০০৩ সালে সংশোধিত আইনে ২(১)(বি) একটি নতুন ধারা সংযোজিত হয়েছে যাতে অনুপ্রবেশকারীর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এইসব অনুপ্রবেশকারীরা

‘নাগরিকত্ব পাবেন না। তবুও, যেহেতু এই আইন তৈরী হবার আগে ১৯৭১ সালের একটা সীমারেখা মেনে চলা হতো, তাই এই আইন তৈরী হওয়ার পরেও ঐ সীমারেখা মেনে চলা হবে”।

কিন্তু এর কোনও ছাপ আইনে নেই। তাছাড়া ১৯৭১ সালকে ভিত্তি বছর ধরার যুক্তিও আদর্শে পরিষ্কার নয়। ১৯৭১-এ ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির সময় ধরে নেওয়া হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সেখানে সুরক্ষিত থাকবে। তেমন কিছু যে ঘটেছে এমন কথা কেউ দাবি করার অবস্থার আছে বলে মনে হয় না।

অথচ এই আইনকে হাতিয়ার করে শুরু হয়ে গেছে রাজ্যে রাজ্যে বাঙালী বিতাড়ন। উড়িষ্যা বিজেপি-বিজেডি সরকার শুধুমাত্র কেন্দ্রপাড়া জেলার মহাকালপাড়ায় ১৫৫১ জন উদ্ধাস্তকে অনুপ্রবেশকারী হিসাবে চিহ্নিত করে এবং দেশ থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেয়। এরা সকলেই হিন্দু এবং ৪৫ থেকে ৫৫ বছর ধরে ঐ এলাকায় বাস করছেন। আন্দোলনের চাপে তাদের দেশ থেকে বের করতে না পারলেও সমস্ত নাগরিক অধিকার হারিয়ে তাদের জীবনযুত অবস্থা। ওড়িশা সরকার সমস্ত জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছে ২৫/৩/৭১-এর পর আসা সমস্ত বাংলাদেশীকে চিহ্নিত করতে এবং ১৬/১২/৭১ পরবর্তী আসা সকলকে চালানের উদ্দেশ্যে পুলিশের হাতে তুলে দিতে।

দিল্লি হাইকোর্ট ও পরে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে প্রতিমাসে ৩০০০ জন অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করে দেশ থেকে বের করে দেবার জন্য।

আসামে ১৯৬৬ সাল বা তার আগে যারা উদ্ধাস্ত হয়ে আসামে গিয়েছিলেন এবং সেখানে বসবাস করছেন এমন ৫ লক্ষ ৫০ হাজার উদ্ধাস্ত ভোটারের নামের পাশে D বা ডাউটফুল অর্থাৎ সন্দেহজনক লিখে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন। এদের বিচারের জন্য ৩৩টি বিশেষ আদালত গঠন করা হয়েছে। সেখানে অনেককেই দেশ ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অথবা অস্থায়ীভাবে তৈরী জেলে রাখা হয়েছে নতুবা বহিষ্কার করা হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, মহারাষ্ট্র ও অন্যান্য বহুরাজ্যে যে সমস্ত উদ্ধাস্ত মানুষেরা বসতি পেয়েছেন তাঁরাও আক্রান্ত। উত্তরপ্রদেশের কানপুর দেহাত জেলা, রামপুর ও পিলভিট জেলা এবং অন্যান্য জেলায় সম্প্রতি প্রায় ৮০০০ উদ্ধাস্তের নাম ভোটার তালিকা থেকে কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে।

দেশ থেকে বহিষ্কার(চালান) এর উদ্দেশ্যে ‘অনুপ্রবেশকারীদের’ সাময়িকভাবে রাখার

জন্য অস্থায়ী জেলাতৈরীর নির্দেশ ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও পাঠিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিনা পাসপোর্টে এদেশে আসা 'অনুপ্রবেশকারীদের' চালানোর জন্য জেলায় জেলায় টাকফোর্স গঠনের নির্দেশ পাঠিয়েছে। হুগলী, পশ্চিম মেদিনীপুর, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় ইতিমধ্যেই গ্রেফতার-আটকের মতো ঘটনা ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গে উদ্ধাস্তদের সংখ্যা অনেক বেশী হওয়ায় সরকার সাবধানে চতুরতার সাথে এগোতে চাইছে।

প্রতিরোধ

সি ইমিগ্রান্ট এন্ড পালসন ফ্রম আসাম আইন, ১৯৫০ (আসাম থেকে অভিবাসী বহিষ্কার আইন, ১৯৫০) যখন বিল আকারে পার্লামেন্টে পেশ হয় তখন সংসদে বিলটির প্রবল বিরোধিতা হয়। তখন আইনের ২ নং অনুচ্ছেদে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব লাভের অধিকার স্বীকৃত হয়।

১৯৬৪ সালের প্রথম সপ্তাহে ভারত সরকার পূর্ব পাকিস্তানের বর্ডার সিল করার কথা ঘোষণা করে— যাতে উদ্ধাস্তের দ্রোত ভারতে প্রবেশ না করে। ১৯৬৪ সালের ২৭ জানুয়ারী এর বিরুদ্ধে কোলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এক কনভেনশন হয়। সেখানে আর. এস. পি., জনসংঘ, ফরওয়ার্ড ব্লক, অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে এই উদ্যোগের বিরোধিতা করেন এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত ও ভবিষ্যতে যারা আসবেন তাদের সকলের প্রতি ভারত রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার কথাও উল্লেখ করেন। পরদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা যৌথ বিবৃতি দিয়ে কনভেনশনের বক্তব্য মেনে নেন।

৬০-এর দশকের শেষভাগ অবধি উদ্ধাস্ত আন্দোলনের একটি পর্যায় চলেছে। বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বাম-ডান উভয়পক্ষের, এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ৭১ পরবর্তীকালে যে উদ্ধাস্তদ্রোত ভারতে প্রবেশ করে তা মূলত গরীব নিরক্ষর কৃষকশ্রেণীর— 'হিন্দু' সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষ। বাংলাদেশ থেকে হতদরিদ্র, মুসলিম জনগোষ্ঠীর কিছুই মানুষও শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণে ভারতে এসেছেন। ৭৭ সাল অবধি এই নিম্নবর্ণের মানুষের অধিকার আন্দোলনে বামপন্থী নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বদান দেখা গিয়েছে। কিন্তু ৭৮ সালে মরিচখাঁপির ঘটনা প্রমাণ করে দেয় পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশ থেকে আগত উচ্চশিক্ষিত উচ্চবর্ণের মানুষ ও অল্পশিক্ষিত বা এই নিম্নবর্ণের মানুষের জীবনের দাম এই নেতৃবৃন্দের কাছে সমান নয়। মূলত এই নিম্নবর্ণের নিরক্ষর মানুষদেরই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঠাই দেওয়া হয়েছিল। এদের না ছিল কোন নথিপত্র না ছিল নথিপত্র সংরক্ষণের মতো অবস্থা। ফলে আজ ২০০৩ সালের সংশোধনীতে যে অংশটা নতুন

৭৮। দেশ হীন হয়ে যাবার আশঙ্কায় ভুগছেন তাঁদের বৃহত্তম অংশটি তথ্যশিলভুক্ত সম্প্রদায়ের মাধ্যমে উদ্ধাস্তদের আন্দোলন তার মূলতঃ দলিত আন্দোলনের চেহারা নিয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের দাবিমতো এদেশে ১ কোটি ৮০ লক্ষ বেআইনী অনুপ্রবেশকারী এসবাস করছেন। ২০০৩-এর আইন বর্তমানে প্রতিটি বাঙালীর সামনে এই প্রশ্নটি হাজির করছে— ৭১ সালের আগে আপনি বা আপনার বাবা এবং মা এদেশের বাসিন্দা ছিলেন কিনা; থাকলে অনুপ্রবেশকারীর সংজ্ঞা অনুযায়ী আপনার (বা আপনার বাবা এবং মায়ের) বৈধ নাগরিকত্ব ছিল কিনা। স্বাভাবিকভাবেই উত্তরের স্বপক্ষে আপনাকে নথি দাখিল করতে হবে, যা করা স্বশিক্ষিত-নিরক্ষর ছিন্নছাড়া ছিন্নমূল উদ্ধাস্ত জনগোষ্ঠীর কাছে প্রায় অসম্ভব। ১০, ২০, ৩০, ৪০ বা ৫০ বছরের আগে যারা পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতে এসেছেন ভারত সরকার তাদের বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠাবার কথা বললেই বাংলাদেশ তাদের ফেরৎ নেবে এমনটা নয়। বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই এদের অস্বীকার করে বসে আছে। ভোটবাজ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো ভোটের সংখ্যা হিসাবে এদের এতদিন ব্যবহার করেছে এবং আইন বহির্ভূতভাবে তাদের হাতে রেশন কার্ড থেকে শুরু করে সমস্ত নথিপত্র তুলে দিয়েছে। মানুষের স্বাভাবিক পরিমায়ী প্রবৃত্তিকে রাজনৈতিক সীমানা দিয়ে বাঁধা উচিত কিনা সেই প্রশ্নকে যদি আজ নাও তোলা হয় তবুও আজও প্রতিদিন এই আইনবহির্ভূত অনুপ্রবেশ চলতে দেওয়া হচ্ছে। অথচ অস্বীকার করা হচ্ছে নাগরিকত্বকে। সুখের খোঁজে যারা ভারত থেকে অন্যত্র চলে গেছেন তাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব সুরক্ষার ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে এমনকি তাদের ভোটারের অধিকার সুরক্ষিত করা হয়েছে সংশোধনী ২০১১ তে। অথচ যারা এই দেশটাকে অধিক সুরক্ষিত মনে করে এখানে বসবাসের জন্য চলে আসছেন তাদের অস্বীকার করা হচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদী এই বিশ্বায়নের যুগে পুঞ্জির জন্য কোন সীমান্ত রাখা হয়নি। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়মকানুন বলে পুঞ্জি অবাধে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত করতে পারবে। উল্টোদিকে এই উপমহাদেশের মধ্যেও মানুষের যাতায়াতকে নিষিদ্ধ করার প্রচেষ্টা চলছে যে অংশে মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে এইসব সীমান্তের সাথে পরিচিত। ৩৯ না। ইতিহাসকে অস্বীকার করে বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে নাগরিকত্বহীন দেশহীন করে ওগলার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। মূলতঃ তথ্যশিলভুক্ত বাংলাভাষী হিন্দু-মুসলিম জনসমষ্টিই এই আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন। এর বিরুদ্ধে লড়াইটাও তাই গড়ে উঠছে শুধু জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে।

গাজে রাজ্যে বাঙালী উদ্ধাস্তদের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন-নাগরিক অধিকার আন্দোলন

সমিতিগুলো এই আন্দোলনে যুক্ত হচ্ছেন। মতুরা মহাসংঘের নেতৃত্বে ২০০৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনশনে অংশগ্রহণ করেন মতুরা সম্প্রদায়ের ২১ জন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক হরিপদ মণ্ডল (৮৪) অনশনের খবর সহ্য করতে না পেরে এক সপ্তাহের মধ্যে মারা যান। কয়েকদিনের মধ্যে আরও দুজন (৮১ বছর ও ৬৯ বছর) অনশনকারীর মৃত্যু হয়। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের কিছু আগে ২০১০ সালের ২৮ ডিসেম্বর মতুরা মহাসংঘের নেতৃত্বে সুবিশাল সমাবেশ হয় কলকাতায়। সেখানে বামফ্রন্ট এবং তৃণমূল উভয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতির ছাড়া ছড়ি পড়ে যায়। কিন্তু ভোটের পরে এই দাবির পক্ষে তাদের কারো কোন পদক্ষেপ চোখে পড়ে নি।

দেশভাগ মুসলমানদের জেহাদী আন্দোলনের দ্বারা হয়নি। কংগ্রেসের হিন্দু প্রতিনিধি, মুসলিম লীগের মুসলিম প্রতিনিধি ও শিখ প্রতিনিধিরা একত্রে ইংরেজদের সাথে বসে দেশভাগের সিদ্ধান্ত নেন। দেশভাগের জন্য তাই শুধু মুসলিমরা দায়ী নন। দেশভাগ না হলে আমরা কখনই দেশান্তরিত হতাম কিনা সন্দেহ। আর একথা ঠিক যে, ধর্মীয় রাজনৈতিক কারণে যেমন মানুষ দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন, তেমনই সুবোধ বিশ্বাস, পরমানন্দ ঘরামী ও আমাদের মত আরও অনেকেই পেটের দায়ে দেশ ছেড়েছেন। যাদের পরিবারের অর্ধেক সদস্য আজও বাংলাদেশে আছেন এবং বহাল তবিয়তে দাপটের সঙ্গে আছেন — তাদের মুখে এসব মানায় না। আসলে এরা নিজেরাই সাম্প্রদায়িক চিন্তায় অধঃপতিত, মুসলমানদের অত্যাচারের কথা অজুহাত, বেশিটা বানানো গল্প।

কিন্তু উদ্ধাস্ত আন্দোলনের বহু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একথাই বলা যায়, যতদিন না ২০০৩-এ সংশোধনী বাতিল করে নাগরিকত্বের অধিকারের অনুকূল ধারা নাগরিকত্ব আইনে সংযোজিত হচ্ছে ততদিন এইসব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতিশ্রুতিকে ভরসা করার কোন বাস্তব কারণ নেই।



Bengali Refugee